হরীতকীর আত্মপ্রকাশ ।

(শ্রীসরোজকুমার মহলানবীশ)

—:•:—

সুরাসুরের সম্মিলিত শক্তিতে ক্ষীরদার্ণব মথিত হ'য়ে যে অমৃত উঠেছিল, যা'র প্রলোভনে স্বয়ং অনাদি কারণ দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ, যা'র জন্য পীত বসনধারী বনমালী মোহিনীরূপ ধারণ ক'রেছিলেন, যা'র প্রভাবে দেববৃন্দ অজর অমর, সেই দিব্য সুধারই আমি বংশসম্ভূত। যেহেতু স্বয়ং দক্ষপ্রজাপতি পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রেছেন যে—

"পপাত বিন্দুর্ম্মেদিন্যাং শক্রস্য
পিবেতোমৃত।
ততো দিব্যাং সমুৎপন্না সপ্তজাতি
হরীতকী"।

আমি কম কিসে? আমি অবতার, ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন! আর আমরা, মানব যাহাতে নীরোগ হয়ে স্বীয় ধর্ম্মপথে বিচরণ ক'র্‌তে পারে, সেজন্য স্মরণাতীত কাল হ'তেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ।

আমরা সাত ভাই—বিজয়া, রোহিণী,—পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। নাম শুনে হয়তো মনে কর্‌তে পার এবং জিজ্ঞাসাও ক'র্‌তে পারে—তোমরা স্ত্রীলোক ভতো হ'তে পারনা। সে ভুলটা কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রকারও ক'রে গেছেন। তাঁরাও আমাদিগকে স্ত্রীলোক ক'রে দাঁড় করিয়েছেন। আমরা আগেই জানতুম যে, এমন দিন আসবে, যে দিন বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র মনোজেন্দ্র আসর ত্যাগ কর্‌বেন এবং জ্যোৎস্না যামিনী কামিনী আসর জমকাবেন। জ্যোৎস্না, যামিনী যখন পুরুষ হ'তে পারে, তখন, বিজয়া রোহিণী কোন্ হিসাবে পুরুষ হবেনা? আমাদের চেহারা যদিও বিভিন্ন রকমের এবং বেশ সুস্পষ্ট, তবুও তোমরা কেন যে বহু খুঁজেও আমাদের বের করতে পাচ্ছনা তা' তো বুঝতেই পাচ্ছিনা। যাহোক আমাদের নিজেদের পরিচয় নিজেরই দিতে হচ্ছে, কারণ তোমাদের কেউ আমাদের চেননা।

প্রথম বিজয়া। বেশ নাদুস্ নুদুস্ গোলগাল চেহারা! তা'র শিরা উপশিরা খুঁজেও বের করতে পারবেনা। তা'র উপর তা'র গুণ গরিমাও সবার চেয়ে ঢের বেশী। তা'র সুদৃষ্টি হ'লে কোন্ রোগের সাহস যে সেখানে যায়! তার পর রোহিণী! সে এত গোল যে কার এণ্ড মহলানবিশের ভাল ফুটবলও তার কাছে হার মানে, তার একটা বিশেষ গুণ এই যে, তা'র স্মরণ নিলে ব্রণ আস্‌তে পারে না শ্রীমৎ ভাবমিশ্রই ব'লেছেন,—বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণ রোহিণী। তাকে না পেয়ে না জানি ব্রণে কত কষ্টই পাচ্ছো—পুতনা বিংশ শতাব্দীর যুবকদের ন্যায় কঙ্কাল সার! তার হাড়গুলো যেন চামড়া ফেটে কলিযুগের নমুনাটা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব! তার গুণ যে নেই তা' নয়। প্রলেপ কাজটা তার একচেটে! তারপর অমৃতা! সে তো কলির ভীম! মাংস বহুল চেহারা!

ম্যালেরিয়ার দেশে তাঁ'র জন্ম, অন্যলোক এ কথা বিশ্বাস করতেই চাইবেন না। তার কাজটাও বেশ! ঠিক যেন পাঠশালার গুরু মশাই! গুরুমশাই বেতের চোটে তাঁর ছাত্রগুলোকে ঠিক রাখেন; সে তা'র প্রভাবে তোমাদের দেহটাকে সংশোধন ক'রতে খুবই ওস্তাদ। অভয়া, সে তো পাঁচটা রেখা বিশিষ্ট অদ্ভুত জীব। গুণ কিন্তু তার বেজায়। সে একজন বড় Eye specialist। ডাঃ জে, এন্, মৈত্র বল, আর যাহারই নাম কর, তাঁরা তা'র কাছে কিছুই নন। (দোহাই তোমাদের যেন party feelings না জাগে। চোখের যে কোন রোগ হোক্, তা'কে ডাক্‌তে যেন ভুলো না। তারি পর জীবন্তী। আমাদের ভেতর সেতো রাজ পুত্র। এমন চেহারা মেলা ভার। টুক্‌টুকে রং। কবির সুরে—

'বর্ণ জিনি স্বর্ণ চাঁপা—'

গুণও কিন্তু ঢের। একেবারে মণিকাঞ্চন সংযোগ। সেতো common medicine of diseases over exist। তারপর চেতকী! সে তো অনেকটা অভয়ার মত। তবে রেখামাত্র তার তিনটে। তোমরা যেমন কেহ কৃষ্ণকায় ও কেহ শ্বেতাঙ্গ, চেতকীও সেরূপ কৃষ্ণ ও শ্বেত ভেদে দু'প্রকার। শ্বেত স্বাধীন—লম্বাও একেবারে ছয় আঙ্গুল, আর কৃষ্ণ পরাধীন—মাত্র এক আঙ্গুল। আমাদিগকে তোমরা যেখানে চূর্ণরূপে ব্যবহার করবে চেতকী সেখানে হাজির—যেন ঠিক দধীচি মুণি; কিরূপ আত্মত্যাগ! চেতকীর একটু বিশেষ গুণ আছে, যা'রা তার ছায়া মাড়িয়েছে, কিম্বা হাতের মু:টায় তাকে নিয়েছে, তারাই কিন্তু টেরটা পেয়েছে বেশ। হাতেই নাও, আর ছায়াতেই বসে,—মলত্যাগ না করে কিন্তু থাক্‌তে পারবে না, মনে থাকে যেন। শাস্ত্রকারেরাও বলেছেন,—

"চেতকী পাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্য.ন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ।
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবত্তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবদ্ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ॥

আমরা কিন্তু রসিক কম নই! একেবারে পঞ্চরসের সমাহার! তবে নেহাৎ ঠেকে লবণ রসটাকে ত্যাগ করেছি—কেন করেছি—নাই বল্লাম। সব রস কিন্তু এক জায়গায় থাকে না, সতর্ক পাহাড়াওয়ালাদের ন্যায় বিভিন্ন জায়গায় জুড়ে আছে। মধুর রস বেশ চালাক, একেবারে মজ্জাগত হয়ে আছে। অম্লরস স্নায়ুতেই তা'র বাসস্থান ঠিক ক'রে নিয়েছে। তিক্ত, কটু, কষায় যথাক্রমে বৃন্তে, ত্বকে ও অস্থিতে বিচরণ কচ্ছে। আমাদের মটো হলো—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

তোমাদের জন্যই আমাদের পৃথিবীতে আসা। যখনই কোষ্ঠ-কাঠিন্য, তখনই চিবিয়ে খাও—সব ঠিক। চোখ লাল হ'য়েগেল, আমাদিগকে একটু মধু দিয়ে চোখের চারদিকে লাগিয়ে দাও ব্যাস্। জন্মিয়ে শিশু মাই খাচ্ছেনা, জীবে আমাদের চূর্ণ একটু লাগিয়ে দাও বেশ হ'য়ে যাবে। বসন্তে দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে—আমাদের অস্থি কোমরে বেঁধে রেখো কোন ভয় নেই! আমার আবার ভয়

কিসের? যথনই জন্মেছি, তখনই জেনেছি, তোমরা আমাকে বৃন্তচ্যুত করবে—হামানদিস্তায় ফেলে গুঁড়িয়ে দেবে, তারপর উদরসাৎ ক'রবে। আমার ভয় কিসের? কিন্তু বলি কখন কি ক'রে আমাদের খেতে হয় তাতো জান? আমারই সেটা ব'লে দেওয়া উচিত।

যদি আমাদের চিবিয়ে খাও, অগ্নি সন্দীপন হ'বে, আর পিশে খেলে মল শোধিত হ'বে। আর যদি সিদ্ধকরে খাও, তবে ধারক হ'বে। হরীতকী যদি ভেজে খাও, তবে ত্রিদোষ নাশক'র্‌বে অর্থাৎ কোন রোগই আর থাকতে পারবেনা।

আর যারা ব্যাধি বর্জ্জিত হ'য়ে দীর্ঘ জীবন লাভ ক'র্‌তে চাও, তারা গ্রীষ্মকালে পিপুল, বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে চিনি, হেমন্তকালে শুঁঠ ও বর্ষার প্রথম ভাগ গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। আর একটা কথা পথক্লান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাসী, পিত্ত প্রকৃতির লোক গর্ভবতী এবং যাদের রক্তস্রাব হ'য়েছে তাদিগকে কিন্তু আমরা মোটেই ভাল বাসি না। কাজেই তারা যেন আমাদিগকে গ্রহণ না করে। তোমাদের শাস্ত্রও বলে—

"অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ
কৃশোলঙ্ঘনক কর্ষিতশ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী নারী বিমুক্তরক্ত স্ত্বভয়ান্ন
খাদেৎ"

তোমাদের দেশে ঢের ঢের ফল আছে আমি বেশ জানি। আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপুরী, বেল, তাল ইত্যাদি। আমি তো ভুলেও কোন দিন শুনতে পাইনি যে, এগুলোকে তোমরা ফল বল। অবতার হিসাবে আমিই শ্রেষ্ঠ, আর ফল বলিলেও আমিই বড়। ফল বলা মাত্রেই আমাকে ও অপর দুটীকে বুঝাবে। যেই বলবে ত্রিফলা, তখনই বুঝবে আমরা ও আমার দুটী জ্ঞাতি ভাই, কিন্তু আম,কাঁঠাল, জাম কাউকে বুঝাবে না। এত গুণ না থাকলে কি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে শ্রীমতী বলেছিলেন—

'মরিলে বাঁধিয়ে রেখো হরীতকীর ডালে'। তোমরা হয়তো বলবে এ কথাটাতো কোন দিন শুনিনি। আরে কি ক'রেই বা শুনবে? তোমাদের মত পাপী যারা আমাদের মত উপকারীর আবাসস্থল হরীতকী গাছ কাটতেও দ্বিধা বোধ করে না তারা কি ক'রেই বা শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝবে। অবশ্য তিনি বলেছিলেন 'মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালের ডালে'। বলার উদ্দেশ্য ইহা ছিল না, শুধু কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে বাক্‌শক্তি লোপ পাওয়ায় হরীতকীর স্থানে তমাল ব'লে ফেলে ছিলেন।

যাক্—এখন আমার ঠিকানাটা দিয়েই তোমাদের নিকট এ যাত্রা বিদায় নিচ্ছি। আমি নির্জ্জনতাই ভালবাসি। কাননই আমার আশ্রয়—তবে লোকের বিশেষতঃ কোন কোন কবিরাজ মশাইদের পোষা হয়ে যে না আছি তাও নয়। তবে সেতো মরমে মরিয়া—। আমার অভিভাবকটী বেশ কিন্তু। তাকে পেয়ে খুবই সুখেই আছি। তিনি আর কেহই নন—স্বয়ং ভোলানাথ। কথিত আছে—

"হরীতকী বনে জাতা।
হরেন প্রতিপালিতা॥
সর্ব্বরোগ হরেন্নিত্যং।
তস্যানাম হরীতকী॥"

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—পূজার ছুটীর পরে ২৭শে কার্ত্তিক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় খুলিয়াছে এবং পূর্ব্ববৎ উত্তমরূপে অধ্যাপনা চলিতেছে।

পরলোক। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগের নায়ক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তিনি সাহিত্যের মায়া, সমাজের মায়া, সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের চির সুহৃদ ছিলেন। ইহার উন্নতি কল্পে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া অনেক সময়ই অনেক কার্য্য করিতেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব যতকাল থাকিবে, ততকাল আমাদের নিকট তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আমরা তাঁহার বিয়োগে যেরূপ কষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, বিয়োগ বিধুরা সহধর্ম্মিণীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব, পুত্র দুইটীকে কি বলিয়া আশ্বাস বাণী প্রদান করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। পরম কারুণিক শ্রীভগবান তাঁহাদের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন। তাঁহার সম্মান প্রদর্শনার্থ ১ দিন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

হরনাথ সাধন সঙ্ঘ।—এই সঙ্ঘ উত্তরোত্তর উন্নতি সোপানে অধিরোহন করিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ভবনেই হইয়াছিল। তাহার পরে ইহার অক্টোবরের অধিবেশন ৫নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট শেঠেদের ঠাকুর বাড়ীতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। দুইটী অধিবেশনেই পাগল হরনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সংপ্রতি গত ৪ কার্ত্তিক ৫৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে ইহার একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট মহাশয়। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন "বিজয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিবৃতি করণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। মিলিটারী অ্যাকাউন্টেন্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত তাগবতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বি, এল, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পীযূষকান্ত মজুমদার "জল বিহার" কীর্ত্তনে এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দত্ত তাঁহার রচিত কয়েকটি শিশু সঙ্গীত কয়েকটি বালক বালিকা দ্বারা গাহয়াইয়া সকলের পরিতৃপ্তি করিয়াছিলেন। সভায় অন্যান্য গীত বাদ্যেরও ব্যবস্থা ছিল। তিন শত পুরুষ এবং বহু সংখ্যক মহিলা এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা সমিতি।—গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে কলিকাতায় কয়েকজন উদ্যমশীল নবীন কবিরাজের চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা সমিতি নামে একটী সমিতি স্থাপিত

হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অতুল বিহারী দত্ত বি, এস, সি এই সমিতির সম্পাদক ও প্রধান উদ্যোগী। আয়ুর্ব্বেদ জলধি মন্থন পূর্ব্বক নানারূপ গবেষণা করাই এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমিতির সাফল্য কামনা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—আগামী ৯ই অগ্রহায়ণ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির বাটীতে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা কর্ত্তৃক তাঁহাদের চির প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিজয়া সম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা ইহার অধিবেশনের পরে ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিব। এই সভায় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কবিরাজ এবং অনেকগুলি ডাক্তার ও আয়ুর্ব্বেদানুরাগী উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তি সভ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন। এই সভা মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতায় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অনেকগুলি সভা স্থাপিত হইয়াছিল।—কোনটিরই সাড়া শব্দ আর পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র এইটিই বহুকাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইলেও সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন।—পাগল হরনাথের দ্বারা উদ্বোধিত "হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবনের" সংবাদ আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ৫৪ নং বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজারে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীমান ইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহা স্থাপন করেন। আমরা পাঠকদিগকে বিশেষ আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, এই "আয়ুর্ব্বেদ ভবন" অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত হইলেও উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই ধাবিত হইতেছে। শ্রীমান ইন্দুভূষণ অনেকগুলি জীর্ণ জটিল—রোগীর চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বড়বাজারে ঠাকুর হরনাথ এই চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই ঔষধালয়ে যাহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্রও প্রবেশ করিতে না পারে—তজ্জন্য [illegible]দি দ্বারা সর্ব্বদাই উপদেশ প্রদান করিতেছেন,—তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছেন,—"চরিত্রবান হইয়া ভিক্ষা করাও শ্রেয়ঃ কিন্তু চরিত্র হীন হইয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তিও প্রার্থনীয় নয়। স্নেহের ইন্দু যেন কখনো চরিত্রহীন না হয়। সে দেবতা হউক।"—ঐকান্তিক ভাবে রোগীর রোগ নিবারণের চেষ্টা কর, রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে সংশয় রহিত না হইয়া রোগীর চিকিৎসা করিও না,—ঔষধাদি প্রস্তুত বিষয়ে কখনও কৃত্রিমতা করিওনা—ইহাই ঠাকুরের উপরোক্ত উপদেশামৃতের উদ্দেশ্য। আমরা তাঁহার এই উপদেশ—আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে পালন করিতেছে দেখিলে সুখী হইব।

মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ।
অপ্যেতানভিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ॥
বিসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন চৈনং পরিশঙ্কতে।
তস্মাৎ পুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্॥
ধর্ম্মার্থৌ কীর্ত্তিমত্যর্থং সতাং গ্রহণমুত্তমম্।
প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্ম্মণা॥

অর্থাৎ রোগী মাতা, পিতা, পুত্র ও বন্ধু সকলকে শঙ্কা করে, কেবল চিকিৎসককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং নিঃসন্দেহে ও নির্ভয়ে তাঁহার নিকট আত্ম বিসর্জ্জন করে। অতএব রোগীকে পুত্রবৎ বিবেচনা করিয়া তাহার রোগ প্রতীকারার্থ সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল থাকা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। বৈদ্য—চিকিৎসা ক্রিয়া দ্বারা লোকের হিতসাধন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, বিপুল কীর্ত্তি, সাধুগণের নিকট পরম আদরণীয়তা ও দেহান্তে স্বর্গবাস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ১৩৩০ সাল | ৩য় সংখ্যা।

কালা জ্বর।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে দেখা যাউক যে কালাজ্বর বলিতে যে রোগ বুঝায়, তাহার উৎপত্তি ক্রম লক্ষণ এবং শারীর বিধানের কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

কালাজ্বরের উৎপত্তি ক্রম।

১। Malaria জ্বরের আবির্ভাব, অবিচ্ছেদী ভাবে জ্বরের স্থিতি, আরোগ্য লাভ, পুনরাক্রমণ, সঙ্গে সঙ্গে প্লীহার এবং কদাচিত যকৃতের বিবৃদ্ধি ও পাণ্ডুবর্ণতা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে রোগের প্রথমাবিস্থায় রক্ত পরীক্ষা করিলে Malariaর বীজাণু পাওয়া যায়, পরে পুনরায় রক্ত পরীক্ষা করিলে স্থানবিশেষে Malariaর বীজাণুর সহিত কালাজ্বরের বীজাণু এবং কোথাও কোথাও মাত্র কালাজ্বরের বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থলে Malariaর বীজাণু গুলি নষ্ট হইয়া যায়।

২। Typhoid Symptoms রূপে কালাজ্বরের আবির্ভাব হয়। প্রথম Typhoid হইয়াছে কি কালাজ্বর হইয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের পর জ্বর মৃদু হইয়া আইসে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা—স্থল বিশেষে যকৃতের বিবৃদ্ধি, পাণ্ডুবর্ণতা আসিয়া কালাজ্বররূপে প্রকাশিত হয়।

৩। প্রথম প্রথম কম্প দিয়া জ্বর আইসে, জ্বর ছাড়িয়া যায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে। ক্রমান্বয়ে প্লীহা

এবং স্থল বিশেষে যকৃতের বৃদ্ধি ও পাণ্ডুভাব দেখা যায়।

৪। জ্বর ছাড়িয়াও আসিতে পারে কিম্বা নাও ছাড়িতে পারে, কিন্তু দিবসে দুইবার করিয়া জ্বর হয় সঙ্গে, সঙ্গে প্লীহা ও —স্থল বিশেষে যকৃতের বৃদ্ধি হয়।

৫। প্রথম প্রথম রোগী অসুস্থতা বোধ করিতে থাকে। কিন্তু কি যে হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, হঠাৎ দেখা যায় যে রোগীর প্লীহা বাড়িয়া গিয়াছে পরে ক্রমান্বয়ে কালাজ্বরের সকল লক্ষণ দেখা যায়।

কালাজ্বর লক্ষণ—দুইবার করিয়া জ্বর হওয়া কালাজ্বরের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, জ্বর অবিচ্ছেদী ভাবে আসিয়া যায়, কোথাও বা জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং পুনরায় দিবসে একবার বেগ হয়। কিন্তু কালাজ্বরের ভোগ কালের মধ্যে কোন সময় না কোনও সময় দিবসে দুইবার জ্বর আসিবেই। জ্বর যে কখন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, দিবা ভাগেই দুইবার আসিতে পারে, রাত্রে ও দুইবার আসিতে পারে, কিম্বা দিবসে একবার ও রাত্রে একবার আসিতে পারে। রোগীর চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, শাদা কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিলে যেরূপ বর্ণ হয় রোগীরও সেইরূপ বর্ণ হয়। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং স্থল বিশেষে যকৃতেরও বৃদ্ধি দেখা যায়। রোগ যত পুরাতন হইতে থাকে, রোগীর শরীর ততই শুষ্ক ভাব ধারণ করে। বক্ষের নিম্নভাগে এবং পেটের উপরে নীল বর্ণের শিরাজাল দৃষ্ট হয়। গলদেশস্থ শিরাসমূহ স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর গাত্রে ময়ূরাকৃতি পিড়কা (Perpuric pafch) বাহির হয়। গলদেশে একপ্রকার ক্ষত দেখা যায় (Cancrum oris)। অনেক সময় ঐ ক্ষত এবং দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়।

রোগীর জীবন বিপন্ন করে। রক্ত হীনতার জন্য পায়ের পাতার শোথ দেখা যায়। ঐ শোথ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উদরী রোগে পরিণত হয়। রোগী সর্ব্বদা ক্ষুধা অনুভব করে, কিন্তু সম্যক আহার করিতে পারে না। অনেক সময় অতীসার ও আমাশা বেখা যায়। রোগীর গাত্রের চামড়া সঙ্কুচিত হয়, চুল রুক্ষ হয় এবং উঠিয়া যায়। উপসর্গরূপে Pneomonia ও Bronchitcs আসিয়া উপস্থিত হয়।

কালাজ্বর উৎপন্ন হইলে শারীর দ্রব্য সমূহের যে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১। চুল—ইহা রুক্ষভাব ধারণ করে এবং উঠিয়া যাইতে থাকে।

২। চর্ম্ম—ইহা পাণ্ডুবর্ণ হয়, সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। শাদা কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টানিলে যেরূপ বর্ণ দেখায় কালাজ্বরের রোগীর চর্ম্মে সেই প্রকার বর্ণ পরিলক্ষিত হয়।

৩। চর্ম্মেরও তন্নিম্নস্থ তন্তু সকলের ক্ষয় উপস্থিত হয় (Necro-biosis)। সাধারণতঃ গলদেশে ইহা পরিলক্ষিত হয়। ইহার ইংরাজী নাম Cancrumoris। ইহা

একটী সাংঘাতিত উপসর্গ। এই ক্ষত হইতে এমন এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে যে, রোগীর কাছে থাকা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। এই ক্ষত অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে এই ক্ষত হইতে প্রভূত পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে।

৪। অন্যান্য জ্বরে জিহ্বা যে প্রকার অপরিষ্কার, থাকে কালাজ্বরে তাহা থাকে না। ইহাতে জিহ্বা বেশ পরিষ্কার থাকে।

৫। পরিপাক শক্তি কমিয়া গেলে ও রোগীর একপ্রকার দুষ্ট ক্ষুধার আবির্ভাব হয় বলিয়া রোগীর আহারের জন্য বড়ই ব্যগ্রতা দেখা যায়। পরিপাক যন্ত্রগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া অনেক সময় অতিসার, আমশা, আমরক্ত প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়।

৬। প্লীহা—এই রোগে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নীচের দিকে প্লীহা ঝুলিয়া পড়িতে পারে, পার্শ্বে বাড়িতে পারে, কোন দিকে যে প্লীহা বাড়িবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। Malariaয় প্লীহা যে প্রকার শক্ত হয় এবং পার্শ্বে যে প্রকার পাতলা (sharp) দেখা যায়, এই রোগে সেইরূপ হয় না। ইহাতে প্লীহা নরম থাকে এবং নোড়ার আকার বিশিষ্ট হয়। রোগ পুরাতন হইলে প্লীহাও শক্ত হয়। প্লীহা এতদূর বাড়ে যে, একেবারে যকৃতের উপর গিয়া পড়ে।

যকৃত :—সাধারণতঃ প্লীহার ন্যায় ইহা তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন স্থলে কিন্তু যকৃত প্লীহা অপেক্ষা বাড়িতে দেখা যায়। কিন্তু প্লীহার ন্যায় যকৃতও নরম থাকে, কিন্তু ইহার পার্শ্বদেশ পাতা (sharp) হয় না। যকৃতে প্রায়শঃ বেদনা থাকে না।

রক্ত :—(ক) এই জ্বরে রক্তের অবস্থা বিশেষ ভাবে বিকৃত হয়। প্লীহা, যকৃত এবং অস্থি মজ্জার দৌর্ব্বল্য বশতঃ রক্তস্থ লোহিত লালকণা উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া তাহাদের সংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। সাধারণতঃ সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রতি মিলিমিটারে পাঁচ মিলিয়ন করিয়া দেখা যায় কিন্তু এই রোগে তিন মিলিয়ন বা ইহা অপেক্ষা আরও কম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

(খ) রক্তস্থ শ্বেত কণাসমূহ (Lancocytes) অত্যধিক পরিমাণে শ্বতকণা হ্রাস হয়। স্বাভাবিক রক্তে সাধারণতঃ প্রতি মিলিমিটারে ৮০০০ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই রোগে ২০০০ হইতে ১৫০০ দেখা যায়। অসেক সময়ে শ্বেত কণার এত হ্রাস দেখা যায যে মাত্র ৮০০ বিদ্যমান থাকে। এই জ্বরে পনিমর্কোনিউক্লিয়ার সেলস্ হ্রাস হয় এবং মনো নিউক্লিয়ার সেল্স্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। Pneomonia আসা ; অতিসার বা গলক্ষত প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে মনো নিউক্লিয়ার সেল্স্ অপেক্ষা পনোনিউক্লিয়ার সেল্স্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই জ্বরে রক্ত বিকৃত হয় বলিয়া গায়ে এক প্রকার লোহিত বর্ণের পিড়কা Perpu ric patch) পরিদৃষ্ট হয়। Cancrumaris হইতে রক্ত ছুটিয়া রোগীর প্রাণ বিপন্ন করে। ইহাতে রক্তের ঘনত্ব (Coagulability) ও ক্ষারত্ব (alkalinity)

নষ্ট হইয়া যায়। রক্তকণার ক্ষয় জন্য পাণ্ডু বর্ণতা এবং পরিণামে কৃষ্ণবর্ণতা আইসে। রক্তহীনতার জন্য প্রথমতঃ পায়ের পাতার এবং ক্রমে সর্ব্বশরীরে শোথ পরিদৃষ্ট হয় পরিশেষে উদরী রোগে পরিণত হয়।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র সমূহের বিকৃতি :—রক্তহীনতা জন্য শরীরের পোষণ ক্রিয়ার বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া শরীর দুর্ব্বল হয় সুতরাং হৃৎপিণ্ড, শিরা, ধমনী প্রভৃতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে রক্তের স্বাভাবিক গতি কমিয়া যায় (Blood pressure becomes low) এই অস্বাভাবিক গতির মৃদুতা নষ্ট করিবার জন্য হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনাধিক্য উপস্থিত হয় এইজন্য রোগীর হৃৎপিণ্ডের আকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (Dilatation the heart)। কালাজ্বরে জ্বরের বেগ কম থাকিলেও নাড়ী দ্রুত হইতে থাকে। গলদেশের দুই পার্শ্বে যে সকল শিরা আছে সেই গুলির দ্রুত স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়।

যন্ত্র :—কালাজ্বরের রোগী শ্বাস প্রশ্বাসে ক্লেশ অনুভব করে। শ্বাস যন্ত্রের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় না তবে অনেক সময় নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস্ এই দুইটী উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দুইটী রোগে শ্বাস যন্ত্রের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তদ্রূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। শরীরে যখন শোথ উৎপন্ন হয় তখন সেই শোথ বিস্তারিত হইয়া ফুস্ফুসের তলদেশে Base of the lungs) উপস্থিত হয় এবং তাহার জন্য ও শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়।

অস্থি ও মজ্জা :—Leishman Donovan Parasites অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করে বলিয়া অস্থিদেশে একপ্রকার বেদনা অনুভূতি হয়।

মস্তিষ্ক :—বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর নাড়ী চক্রের শৈথিল্য দ্রুত পরিলক্ষিত হয় (Nervous prostration) রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, এবং স্থান বিশেষে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

মূত্রযন্ত্র :—এই রোগে মূত্রযন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সাধারণ জ্বররোগে মূত্রের যে পরিবর্ত্তন হয় ইহাতেও তদ্রূপ হয় শোথ হইবার পূর্ব্বে ও পরে প্রস্রাবের সহিত Albumen ক্ষরিত হইতে থাকে।

স্বেদন যন্ত্র :—বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না

ক্রমশঃ

পিত্ত।

[কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ]

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বায়ুর স্থান, গুণ, কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এখন পিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। অবশ্য বায়ু, পিত্ত, কফ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করা যোগজ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করিতে হইলেও সে একখানি বিশাল গ্রন্থ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তাদৃশ জ্ঞান, মাদৃশ ক্ষীণ ব্যক্তির সম্ভবেনা। তবে সামান্য বুদ্ধি দ্বারা যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিব।

পিত্তশব্দে আমরা দেহ সন্তাপ বুঝি, দেহ সন্তাপ বা শরীরোষ্মা পিত্তেরই স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। জ্বর বিজ্ঞানে ভ্রমণে কথিত হইয়াছে যে "উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরোনাস্ত্যুষ্মণা বিনা" ইত্যাদি। অর্থাৎ পিত্ত ভিন্ন শরীরে কোন অন্য উষ্মা বা তাপ নাই। দৈহিক তাপের যখন বৃদ্ধি দেখিতে পাই তখন পিত্তেরই বৃদ্ধি এবং তাপের হ্রাস দেখিলে পিত্তেরই হ্রাস বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকি, এই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা পিত্ত ও দেহোষ্মা যে এক ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

আবার সুশ্রুত পিত্তশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা তপ সন্তাপে তপ ধাতুর উত্তর ক্তদ্‌বিহিত ক্ত প্রত্যয় করিয়া, নিপাতনে পিত্তশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তপ ধাতুর অর্থ সন্তাপ। তথাচ "গণনালা তপ ধূপ সন্তাপে" অতএব পিত্ত আর শরীরগত উষ্মা যে অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পিত্তের গুণ আলোচনা করিলেও পিত্তকে তাপ না বলিয়া উপায় নাই। পিত্তের গুণ চরক বলিয়াছেন "সস্নেহ মুষ্ণং দ্রবমম্লং সরং কটু"। দেহস্থিত দোষ ধাতু মলের মধ্যে কেবল মাত্র পিত্তেরই উষ্ণগুণ দেখিতে পাই। যদিও রক্তের উষ্ণ গুণ আছে কিন্তু সে উষ্ণ গুণ রক্ত বা পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হয় বলিয়া।

আবার যখন দেহের সন্তাপ বর্দ্ধিত হয় তখন পিত্ত বৃদ্ধি অনুমান করিয়া পিত্ত হ্রাসক ঔষধ অন্ন বিহারের প্রয়োগ করতঃ পিত্তক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহ সন্তাপের লাঘব দেখিতে পাই। পুনঃ দেহ সন্তাপের ক্ষীণতা দর্শন করিয়া পিত্তবর্দ্ধন দ্বারা দেহের তাপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া থাকি।

এই পিত্তের মৌলিকতা অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, পঞ্চমহাভূতান্তর্গত তেজ আর এই পিত্ত একই পদার্থ, আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে পঞ্চমহাভূতকে বৈশে-

---

*যদিও রক্তের উষ্ণগুণ আছে, কিন্তু সে উষ্ণগুণ রক্ত বা পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হয়।

যিক দর্শন সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অর্থাৎ পরমাণু রূপ মহাভূতগণ সূক্ষ্ম এবং পরমাণু সমবায়রূপ পঞ্চভূত স্থূল। অতএব আমাদের আলোচ্যমান তেজোময় পিত্ত সূক্ষ্মরূপে একস্থানে থাকিয়া সর্ব্বত্র স্ব-ক্রিয়া বিস্তার করে, তাই মহামতি সুশ্রুতাচার্য্য বলিয়াছেন, "তত্রস্থমেব চাত্ম শক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থানাং শরীরস চাগ্নি কর্ম্মানুগ্রহং করোতি," অর্থাৎ পক্কামাশয় মধ্যস্থ পিত্ত আত্মশক্তি দ্বারা অন্যান্য পিত্তস্থানে বল দান করে, এ স্থানে আত্ম শক্তি শব্দে পিত্তের সূক্ষ্মত্বই লক্ষিত হইতেছে। নতুবা স্থূল পিত্ত একস্থ থাকিয়া শরীরে সর্ব্বত্র তেজ বিধান করিতে পারে না। সূর্য্য যেমন এক গগনে অবস্থান করিয়া স্বকীয় অংশু দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র আলোক ও তেজ বিতরণ করে, তেমনিএক পিত্ত গ্রহণী নাড়ীতে থাকিয়া স্বীয় সূক্ষ্মাংশ দ্বারাদেহে তাপ বিতীর্ণ করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্মপিত্ত নিত্য ও অব্যয়, সুতরাং জন্মাদি অবসান পর্য্যন্ত দেহ অনুবর্ত্তন করে, পরন্তু মহাভূতে বিলীন হইয়া যায়। আর স্থূল পিত্তের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই, এবং সেই হ্রাস বৃদ্ধির সমতাই চিকিৎসা। সেই জন্যই আয়ুর্কেদের এই বিরাট আয়োজন।

মহর্ষি সুশ্রুত পিত্তকে 'অন্তরগ্নি' আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন এই—"আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তেদহন পচনাদিভি বর্ত্তমানেঽগ্নিবদুপচারঃ ক্রিয়তেঽন্তরগ্নিরিতি," অর্থাৎ অগ্নির দহন পচনাদি গুণের সমতাহেতুক পিত্তকে অগ্নি বলিয়া উপচার করা হইল; এবং এই পিত্তকেই আবার অন্তরগ্নি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুশ্রুতের এই পাঠ পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে, পিত্ত অন্তরগ্নি নামে ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পিত্তকে সরলভাবে অন্তরগ্নি না বলিয়া মহাত্মা সুশ্রুত ব্যপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলেন কেন? এখন তাহাই আমাদের অন্বেষ্টব্য। আমাদের মনে হয়, দ্রবতেজঃ সমুদয়াত্মকপিত্তের অন্তরগ্নি সংজ্ঞা সুশ্রুতের অভিপ্রেত নহে। তাই তিনি দহন পচনাদিরূপ অগ্নিগুণের সহিত তেজঃস্বভাব পিত্তেরই ক্রিয়াসাম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রবস্বভাব পিত্ত অগ্নিগুণের বিরোধিহেতু তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্যই ব্যপদেশ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মহামতি বাগ্‌ভট ও পিত্তের তৈজস অংশকে অগ্নি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা "পঞ্চভূতাত্মকত্বেহপি যত্তৈজস্কিসগুণোদয়াৎ। ত্যক্তদ্রবত্বং পাকাদিকর্ম্মণাঽনলশব্দিতং"। পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক হইলেও তেজগুণের আধিক্যহেতুক সোমগুণ পরিত্যাগ করতঃ পাকাদি কর্ম্মদ্বারা অনল বলিয়া অভিহিত হয়। ত্যক্তদ্রবত্বং এই শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার অরুণ দত্ত বলিয়াছেন ক্ষপিতসোমগুণত্বেন ত্যক্তদ্রবত্বং'। তথা সংগ্রহকার মাধবকর গ্রহণীনিদানে বলিয়াছেন "আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যজলন্তপ্তমিবানলং" তাহার টীকাকার বিজয়রক্ষিত টীকা করিয়াছেন "যথা উষ্ণগুণমপি জলং অনলং হন্তি, তথা দ্রবাংশ পরিবৃদ্ধং পিত্তং উষ্ণরূপং অগ্নিং হন্ত্যেন এই ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টই প্রাভীতি হয় যে দ্রবাত্মক পিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উষ্মাত্মক পিত্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং মন্দাগ্নিই জন্মিয়া থাকে। এ বিষয়ে চরকাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণ আছে তাহাআমার যথাসময়ে দেখাইব।

এই অগ্নিসংজ্ঞক পিত্ত ত্রয়োদশ প্রকারে

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা পঞ্চভূতাগ্নি পাঁচ প্রকার, রসাদিশুক্রান্তধাতুর অন্তর্গত সপ্তধাত্বগ্নি এবং পাচকাগ্নি একপ্রকার, এই মোট ত্রয়োদশ প্রকার উষ্মারূপ অগ্নি আমাদের দেহে বিরাজ করিতেছে। এখন আমরা ক্রমশঃ সেই ত্রয়োদশাগ্নির কার্য্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

চরক গ্রহণী চিকিৎসায় বলিয়াছেন "ভৌ মাস্মাগ্নেয় বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ। পঞ্চাহার গুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি॥ ইহার ভাবার্থ এই ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে যে পাঁচপ্রকার উষ্মা আছে, সেই পঞ্চোষ্মা পঞ্চভূতময় আহার্য্য দ্রব্য যথাক্রমে পরিপাক করিয়া থাকে, অর্থাৎ ক্ষিতিস্থ তেজ পার্থিব ভক্তাংশ, জলীয় তেজ, জলীয় ভক্তাংশ তৈজস তেজ, তৈজস ভক্তাংশ আকাশীয় তেজ, আকাশীয় ভক্তাংশ পরিপাক করিয়া থাকে। ধাত্বগ্নি সমন্ধে বলিয়াছেন "সপ্তভি র্দেহ ধাতরোধাত বো দ্বিবিধং পুনং। যথাস্বমাগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্ট প্রসাদতঃ॥ রসরক্তাদি সপ্তধাতু মনুষ্যদিগের দেহ রক্ষা করিতেছে, সেই সপ্ত ধাতুর অন্তর্গত যে সমস্ত তেজরূপ অগ্নি আছে তদ্দ্বারা ধাতু সকল পরিপক্ক হইয়া অসার ভাগ কিট্ট রূপ মলভাবে এবং সারভাগ প্রসাদ রূপে পরিণত হয়, পাচকাগ্নির কথা বলিয়াছেন "অন্নম্যপ চ্য সর্ব্বেষাং পক্তৃণামধিকোমতঃ।" পাদ ক্রিয়া নিষ্পাদক অগ্নি সমূহের মধ্যে অন্নপাচক অগ্নিই প্রধান।

এই ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নিই অন্তরাগ্নি শব্দ বাচ্য। এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নির আবশ্যকতা কি? এবং ইহারা কেমনভাবেই বা পাক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। গ্রহণীস্থিত পাচক পিত্তকে পাচকাগ্নি বলে, এই পাচকাগ্নিই অন্যান্য অগ্নির মধ্যে প্রধানতম। তাহার কারণ চরক বলিয়াছেন "তন্মূলা তেহি তদ্ বৃদ্ধি ক্ষয় বৃদ্ধি ক্ষয়াত্মকাঃ" অর্থাৎ সেই পাচকাগ্নিই অন্যান্য অগ্নির মূল, এবং পাচকাগ্নি ক্ষয়ে অন্যান্য অগ্নিসমূহেরও ক্ষয় ও তথা বৃদ্ধিতে অপর অগ্নিরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে চরকের এই কারণত্ব অধ্যয়ন করিয়া বুঝিলাম যে, ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নির মূলাধার পাচকাগ্নি, সেই জন্যই পাচকাগ্নিকে পক্তৃনামাধিক বলিয়া মহর্ষিগণ ঘোষণা করিয়াছেন, এই পাচকাগ্নি অমাশয় প্রবিষ্ট ভুক্তদ্রব্য পপিপাক করিয়া রস উৎপাদন করে, রস পুনঃ পঞ্চভূতাগ্নিদ্বারা পরিপক্ক হইয়া রস ধাতুতে পরিণত হয়। এই ভূতাগ্নির পরিপাকে মলভূত শ্লেষ্মার উৎপত্তি হয় বলিয়া মনে হয়। ভূতাগ্নির পরিপাক স্বীকার না করিলে, যথা ষড়রস দ্রব্য ভোজন করিলেও জঠরানলের সংযোগে অন্যান্য রস পরাভূত হইয়া মধুর রসেরই প্রাধন্য দেখা যায়, যথা পঞ্চভূতেরও কোন তারতম্য ঘটার আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু জঠরানলের পরেও যখন পঞ্চভূতাগ্নির পাক হয় তখন পঞ্চভূতের নির্ব্বিকারত্বই প্রতীত হয়, বস্তুতঃ ভূতাগ্নির প্রয়োজনীয়তা আছেই, পঞ্চ ভূতাত্মক দ্রব্য স্ব স্ব তেজদ্বারা পরিপক্ক হইয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে পাক শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে, নতুবা অগ্নির কার্য্য সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারেনা। পাক

শব্দের অর্থ অবস্থান্তর পরিণতি অর্থাৎ স্বভাবস্থিত পদার্থ বিশিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন গুণ কর্ম্মে পরিণত হওয়াকে পাক বলা যায়। দেখুন তণ্ডুল পক্ক হইয়া ওদনে পরিণত হয়। এক্ষণে তণ্ডুলের কাঠিন্য গুণের ধ্বংশ হইয়া কোমলতা গুণে পরিণতি হইয়াছে। অত এব পাঞ্চভৌতিক অগ্নি দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যের পাক হয় বলিলে অবস্থান্তর পরিণতি বুঝিতে হইবে, সেই অবস্থানান্তর কি তাহাই এখন চিন্তা, এ অবস্থান্তর বোধ হয় স্থূলত্বের সূক্ষ্মত্বে পরিণত। স্থূল পঞ্চ মহাভূত দ্রব্য সমূহ প্রথমে পাচকাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া মলমূত্রাদি রূপ অসারাংশ পরিত্যাগ করতঃ দ্রব রসরূপে পরিণত হয়, এই রস স্বযোনি দ্রব্য হইতে সূক্ষ্ম, তৎপরে পুনঃ সেই রস স্বকারণ পঞ্চভূতের তেজরূপ অগ্নিদ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মাক্ত মল ভাগ বর্জ্জন করতঃ বিশুদ্ধ রস ধাতুতে পরিণত হয়। এই রস ধাতু স্থূল দ্রব্য হইতে যে সূক্ষ্মতম তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। আবার এই সারভূত রস ধাতু ধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সেই স্থূল ভাগ রস ধাতুতেই থাকিয়া যায়; এবং স্থূল ভাগ রস ধাতুতে পরিণত হয়, এই প্রকারে রসাদি শুক্রান্ত সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, জঠরানল দ্বারা যেমন ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ক হইয়া রস উৎপন্ন হয়, তেমনি আহার রসও পরিপক্ক হইয়া রস ধাতুতে পরিণত হইতে পারে, সুতরাং ভূতাগ্নির আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে আমরা বলিব যে, পাচকাগ্নি ও ভূতাগ্নি স্বরূপতঃ একই পদার্থ, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সংজ্ঞা মাত্রের ভেদ। পাচকাগ্নি স্থূল পঞ্চমহাভূতাত্মক দ্রব্যকে পরিপাক করে, অতএব সেও স্থূল, ভূতাগ্নি তাহা হইতে সূক্ষ্ম রসকে পরিপাক করে, সুতরাং সে সূক্ষ্ম। অবার ধাত্বাগ্নি আহার রস হইতে সূক্ষ্মতর রসধাতুকে পরিপাক করে তাই সে সূক্ষ্মতর। লৌকিক পাকক্রিয়ার সহিত এই পাকক্রিয়ার সাদৃশ্য চিন্তা করিলেই স্থূল সূক্ষ্মের বেশ অনুমান হয়। পাকের প্রথম অবস্থায় যতটা তাপের প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয় অবস্থায় তাহা হইতে অল্প, আবার তৃতীয় অবস্থায় বা আসন্ন পাকে তাহা হইতেও মৃদু তাপের প্রয়োজন হয়। তেমনি আমাদের কাঠিন্যাদি ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিতে যতটা তাপের প্রয়োজন, ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন রসকে পরিপাক করিতে, তাহা হইতে মৃদু তাপের প্রয়োজন, পুনঃ রসধাতুকে পরিপাক করিতে মৃদুতর তাপেরই আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তাই মহাযগণও পাচকাগ্নি, ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নি এই তিন প্রকারে তাপের তীক্ষ্ণত্ব ও মৃদুত্ব ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

নিদানপরিশিষ্টম্ ।

(স্বর্গীয় কবিরাজ হারাধন বিদ্যারত্ন)

অতিসারঃ ।

কেচিৎ প্রাহুর্নৈকরূপপ্রকারং
নৈবেত্যেবং কাশিরাজস্ত্ববোচৎ ।
দোষাবস্থা তস্য নৈকপ্রকারা
কালে কালে ব্যাধিতস্যোদ্ভবন্তি ॥
শরীরিণামতীসারঃ সম্ভূতো যেন কেনচিৎ ।
দোষাণামেব লিঙ্গানি কদাচিন্নাতিবর্ত্ততে ॥
স্নেহাজীর্ণনিমিত্তস্তু বহুশূলপ্রবাহিকঃ ।
বিসূচিকানিমিত্তস্তু চান্যোঽজীর্ণনিমিত্তজঃ ।
বিষার্শঃ ক্রিমিসম্ভূতো যথাস্বং দোষলক্ষণঃ ॥
শ্যাবং বা বিট্‌সক্তমুত্রোঽল্পকূজী-
স্তম্ভাপানঃ সল্পকট্যুরুজঙ্ঘঃ ।
বাতোদ্ভূতো রোগ এষোঽতিসারো
বিজ্ঞাতব্যঃ সংপ্রদিষ্টশ্চ তজ্‌জ্ঞৈঃ ॥
দুর্গন্ধ্যুষ্ণং বেগবৎ বিট্ চ পিত্তা-
দ্বিত্তাভিন্নং স্বিন্নদেহোঽতিতীক্ষ্ণং ॥
তন্দ্রানিদ্রাগৌরবোৎ ক্লেশসাদী
বেগাশঙ্কীসৃষ্টবিট্‌কঃ কফাচ্চ ॥
তন্দ্রাযুক্তো মোহসাদাস্যশোষী
সর্ব্বোদে বৈর্ব লবৃদ্ধেষসাধ্যঃ ॥
ভয়জস্যাতিসারস্য চিহ্নং বাতাতিসারবৎ ॥

গ্রহণী রোগঃ ।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা ।
পক্বামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
অগ্ন্যধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্‌গ্রহণী মতা ।
অপক্বং ধারয়ত্যন্নং পক্বং সৃজতি পার্শ্বতঃ

যশ্চাগ্নিঃ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টো রোগানীকে চতুর্ব্বিধঃ।
তস্যাপি গ্রহণীদোষং সমবর্জ্জ্যং প্রচক্ষ্মহে॥

অর্শো রোগঃ।

অর্শঃসু দৃশ্যতে রূপং যদা বৈ দোষয়োর্দ্বয়োঃ।
সংসর্গং তং বিজানীয়াৎ সংসর্গঃ স চ ষড্বিধঃ॥
কানি দীর্ঘাণি হ্রস্বানি কান্তণূনি মহান্তি চ।
বিষমাণি চ বৃত্তানি কানিচিজ্জটিলানি চ।
অন্তর্মুখানি কান্যেব চান্তর্বক্রাণি কানিচিৎ।
যথাস্বং দোষবর্ণানি সহজানি ভবন্তি হি॥
অর্শোভিস্তৈরপি নরো জন্মপ্রভৃতিপীড়িতঃ।
ভবেদতিকৃশো দীনো বিবর্ণঃ ক্ষাম এব চ।
বিবদ্ধবাতবিণ্মূত্রশর্করাশ্মরি পীড়িতঃ।
ত্যজেন্নিয়তসম্বদ্ধশুষ্কপক্কামভিন্নবিট্।
তথান্তরান্তরাশ্বেতং হরিৎ পীতঞ্চ পিচ্ছিলং।
পাণ্ডুরক্তারুণতরং সান্দ্রং কুণপগন্ধি চ।
আমং বর্চ্চস্ত্বপি স চ প্রভূতং গুদশূলবান্।
নাভৌ বস্তৌ বঙ্ক্ষণে চ তস্য স্যাৎ পরিকর্ত্তিকা।
পরিহর্ষঃ প্রমেহশ্চ ভবেচ্চাপি প্রবাহিকা।
বিষ্টম্ভাটোপাম্লকূজোদাবর্ত্তী হৃদি লেপবান্।
প্রভূতবদ্ধশুষ্কাম্লোদ্গারী হীনবলানলঃ।
দুঃখোপচারশীলশ্চ ক্রোধনশ্চাল্পশুক্রবান্।
সকাসশ্বাসতমকতৃষ্ণাহৃল্লাসপীনসৈঃ।
অবিপাকারুচিচ্ছর্দ্দিক্ষুদ্ভিশ্চ পরিপীড়িতঃ।
শিরঃকর্ণাক্ষিরোগী চ ক্ষামভিন্নাবলস্বরঃ।
শূনপাদাক্ষিকূটান্তকরঃ সজ্বর এবচ।
সর্ব্বপার্শ্বাস্থিশূলী চ সাঙ্গমর্দ্দোঽন্তরান্তরা।
পৃষ্ঠপার্শ্বকুক্ষিবস্তিত্রিকহৃদ্গ্রহপীড়িতঃ।
প্রধ্যানশীলশ্চ তথা স ভবেদ্ধি মহালসঃ॥

অগ্নিমান্দ্যং।

অতিমাত্রমজীর্ণেঽপি গুরুচান্নমথাশ্নতঃ।
দিবাপি স্বপতো যস্য পচ্যতে সোঽগ্নিরুত্তমঃ॥

নরে ক্ষীণকফে পিত্তং কুপিতং মারুতানুগং।
স্বোষ্মণা পাবকস্থানে বলমগ্নেঃ প্রযচ্ছতি।
তদালব্ধবলো দেহং বিরুক্ষেৎ সানিলোঽনলঃ।
অভিভূয় পচত্যন্নং তৈক্ষ্ণ্যাদাশু মুহুর্মুহুঃ।
পক্ত্বান্নং সততো ধাতূন্ শোণিতাদীন্ পচত্যপি।
ততো দৌর্ব্বল্যমাতঙ্কান্ মৃত্যুঞ্চোপনয়েন্নরং।
ভুক্তেঽন্নে লভতে শান্তিং জীর্ণমাত্রে প্রতাম্যতি।
তৃট্কাসদাহমূর্চ্ছাঃ স্যুর্ব্যাধয়ো হ্যগ্নিসম্ভবাঃ॥

অজীর্ণং।

উদ্গারেঽপি বিশুদ্ধতামুপগতে কাঙ্ক্ষানভক্তাদিষু
স্নিগ্ধত্বং বদনস্য সন্ধিষু রুজা কৃত্বা শিরোগৌরবং।
মন্দাজীর্ণরসে তু লক্ষণমিদং তত্রাতিবৃদ্ধে পুন-
র্হৃল্লসজ্বরমূর্চ্ছনাদি চ ভবেৎ সর্ব্বাময়ক্ষোভণং॥

বিসূচিকা।

বিবিধৈর্বেদনাভেদৈর্বায্বাদিভূশকোপতঃ।
সূচীভিরিব গাত্রাণি ভিনত্তীতি বিসূচিকা॥

অলসকঃ।

প্রয়াতি নোর্দ্ধং নাধস্তাদাহারো নচ পচ্যতে।
আমাশয়েঽলসীভূতস্তেনসোঽলসকঃ স্মৃতঃ॥
পীড়িতং মরুতেনায়ং শ্লেষ্মণা বদ্ধমন্তরা।
অলসং ক্ষোভিতং দোষৈঃ শল্যত্বেনাবসংস্থিতং।
শূলাদীন্ কুরুতে তীব্রান্ ছর্দ্দ্যতীসারবর্জ্জিতান্॥

ক্রিমিরোগঃ।

সহজাঃ ক্রিময়ো জ্ঞেয়াঃ সূক্ষ্মাশ্চরককীর্ত্তিতাঃ।
উক্তসংখ্যাতিরিক্তাস্তে ন ভবন্তি বিকারদাঃ॥

পাণ্ডুরোগঃ।

দোষাঃ পিত্তপ্রধানাশ্চ যস্য কুপ্যন্তি ধাতুষু।
শৈথিল্যং তস্য ধাতূনাং গৌরবঞ্চোপজায়তে।
ততো বর্ণবলস্নেহা যে চান্যেঽপ্যোজসো গুণাঃ।

ব্রজন্তি ক্ষয়মত্যর্থং দোষদূষ্যপ্রদূষণাৎ।
সোঽম্লরক্তোঽম্লমেদস্কো নিঃসারঃ শিথিলেন্দ্রিয়ঃ।
বৈবর্ণ্যং ভজতে তস্য হেতুং শৃণু সলক্ষণং।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ।
বিদগ্ধেঽন্নে বিরুদ্ধান্নাৎ মৈথুনাৎ ক্ষারভোজনাৎ।
প্রতিকর্ত্তুশ্চ বৈষম্যাৎ বেগানাঞ্চ বিধারণাৎ।
কামচিন্তাভয়ক্রোধশোকোপহতচেতসঃ।
সমুদীর্ণং যথা পিত্তং হৃদয়ে সমবস্থিতং।
বায়ুনা বলিনা ক্ষিপ্তং সংপ্রাপ্য ধমনীর্দশ।
প্রপন্নং কেবলং দেহং ত্বন্মাংসান্তরসংস্থিতং।
প্রদূষ্যকফবাতাংশ্চ ত্বন্মাংসানি করোতি তৎ।
পাণ্ডুহারিদ্রহরিতান্ বর্ণাংশ্চ বিবিধান্ ত্বচি।
স পাণ্ডুরোগ ইত্যুক্তস্তস্য লিঙ্গং ভবিষ্যতঃ॥
হৃদয়াস্পন্দনং রৌক্ষ্যং স্বেদাভাবঃ শ্রমস্তথা॥
সম্ভূতেঽস্মিন্ ভবেৎ সর্ব্বঃ কর্ণক্ষ্বেড়ো হতানলঃ।
দুর্ব্বলঃ সীদনোঽম্লদ্বিট্ শ্রমভ্রমনিপীড়িতঃ।
গাত্রশূলজ্বরশ্বাসগৌরবারুচিমান্নরঃ।
মৃদিতৈরিব গাত্রৈশ্চ পীড়িতো মথিতৈরিব।
শূনাক্ষিকূটো হরিতঃ শীর্ণরোমা হতপ্রভঃ।
কোপনঃ শিশিরদ্বেষী নিদ্রালুঃষ্ঠীবনোঽম্লবাক্।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টকট্যূরুপাদরুক্ সদনানি চ।
স্ফুরণারোহণায়াসৈর্বিশেষশ্চাস্য বক্ষ্যতে॥
আহারৈরুপবাসৈশ্চ বাতলৈঃ কুপিতোঽনিলঃ।
জনয়েৎ কৃচ্ছ্র পাণ্ডুত্বমঙ্গমর্দ্দং জ্বরং তথা।
বর্চ্চঃশোষাস্যবৈরস্যং শোথং পার্শ্বশিরোরুজং॥
পিত্তলস্যাচিতং পিত্তং যথোক্তৈঃ স্বৈঃ প্রকোপণৈঃ।
দূষয়িত্বা তু রক্তাদীন্ পাণ্ডুরোগায় কল্পতে।
স ভবেৎ হরিতাভো বা মূর্চ্ছাযেন নিপীড়িতঃ।
স্বেদনঃ শীতকামশ্চ নচান্নমভিনন্দতি।
কটুকাস্যো নচাস্যোষ্ণমুপশেতেঽম্লমেবচ।
উদ্গারোঽম্লো বিদাহশ্চ বিদগ্ধেঽন্নস্য জায়তে।

দৌর্ব্বল্যমস্য চাস্যস্য দৌর্গন্ধ্যং তম এবচ ॥
বিবৃদ্ধঃ শ্লেষ্মলৈঃ শ্লেষ্মা পাণ্ডুরোগং স পূর্ব্ববৎ।
করোতি লোমহর্ষঞ্চ সাদং মূর্চ্ছাং ভ্রমং ক্লমং।
শ্বাসং কাসং তথা চ্ছর্দ্দিমরুচিং বাক্স্বরগ্রহঃ।
কটুরুক্ষাম্লকামিত্বং লবণাস্যত্বমেবচ ॥
সর্ব্বান্নসেবিনঃ সর্ব্বে দুষ্টা দোষাস্ত্রিদোষজং।
ত্রিদোষলিঙ্গং কুর্ব্বন্তি পাণ্ডরোগং সুদুঃসহং ॥
মৃত্তক্ষণাৎ ভবেৎ পাণ্ডুস্তন্দ্রালস্যানিপীড়িতঃ।
সশ্বাসকাসশোষার্শঃ সদারুচিসমন্বিতঃ।
শূনপাদাননকরঃ কৃশাঙ্গঃ কৃশপাবকঃ ॥
অন্তে শূনঃ কৃশো মধ্যোহন্যথা বা গুদশেফসি।
শূনো জ্বরাতিসারাভ্যৈর্মৃতকল্পস্ত পালকী ॥

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈল পাক বিধি।

(সমালোচনার-পুর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন]

——:০:——

বিগত ১৩২৯ সনের আশ্বিন মাসের "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈল পাক বিধি শীর্ষক সমালোচনাখানি আমি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথমে আমার আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র-মোহন দাসগুপ্ত ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ তিনি উল্লিখিত বিষয়ে সমালোচনা চলিতে পারে বলিয়া অনুমোদন করিলে উহা প্রকাশের জন্য "আয়ুর্ব্বেদে" প্রেরিত হইয়াছিল, অতঃপর বঙ্গীয় স্বনামধন্য কতিপয় কবিরাজ মহোদয়ের উল্লিখিত বিষয়ে ব্যাক্তগত অভিমত অবগত হওয়ার জন্য কয়েকখানা পত্র লিখি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একমাত্র রাজসাহী নিবাসী মহামান্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিমত ভিন্ন অন্য কাহারও মতামত অবগত হইতে পারি নাই, যাহা হউক উক্ত কবিরাজ মহাশয় উক্ত বিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত

মন্তব্য পোষ্টকার্ডে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ

রাজসাহী

১লা কার্ত্তিক

"বিনয় পুরসরঃ নিবেদনমেতৎ

আপনার পত্র প্রাপ্ত হইলাম। ঘৃতে মূর্চ্ছা ও গন্ধ পাকের কোন ব্যবহার নাই। তৈলের মূর্চ্ছা ও গন্ধ পাকের কোন বিধি আছে বলিয়া জানি না অর্থাৎ উহা শাস্ত্রীয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। উহা প্রাচীন বৈদ্যগণ সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্য গন্ধপাক দিয়া থাকেন। মূর্চ্ছা পাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয় ইহাই আমার বিশ্বাস। গন্ধপাক দেওয়াতে কোন কোন তৈলের গুণ সামান্য কিছু কম হইলেও হইতে পারে।" উপরোক্ত পত্র হইতে মৎকৃত সমালোচনার কতকগুলি বিষয়ের সমর্থা সূচীত হইতেছে যথাঃ—

১। ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছা বিধি ও তিল তৈলের গন্ধপাক বিধি প্রাচীন নহে। উহা আধুনিক, প্রক্ষিপ্ত ও অশাস্ত্রীয় (ঘৃতের কোন প্রক্ষিপ্ত গন্ধপাক বিধি ও প্রচলিত নাই সুতরাং উপরোক্ত পত্রের তদুক্তি বাহুল্য মাত্র)

২। মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক তৈলে সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ উৎপাদনে বিলাস পরায়ণ রাজা মহারাজ এবং সম্ভ্রান্ত বড় লোকের মনস্তুষ্টির জন্য কোন প্রাচীন বৈদ্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং কালক্রমে চিকিৎসক সমাজে উহা এতদূর বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে। উপরোক্ত পত্র হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় না কি?

৩। "মূর্চ্ছা পাক দিলে তৈলের বর্ণ ভাল হয়" এই উক্তি হইতে পক্ষান্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না কি যে স্নেহের "আমদোষ" কল্পনা অস্বীকার্য্য এবং সর্ব্বত্র মূর্চ্ছা পাকের প্রচলন জন্য অকৃত্রিম বিশুদ্ধ ঘৃত তৈলাদির দোষারোপ মাত্র?

৪। উপরোক্ত পত্রে মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা স্নেহের গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা তাহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং ঘৃতের মূর্চ্ছা বিধিতে লিখিত "বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ী এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দাঁড়ায়নাকি?

৫। তিল তৈলের গন্ধপাকে ক্ষেত্র বিশেষে গুণহানি হইতে পারে এ কথাও স্বীকার্য্য।

এইরূপ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে আমার লিখিত কবিরাজ মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিমত মৎকৃত সমালোচনার সর্ব্বাংশে অনুকূল।

আমার পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে প্রেরিত হওয়ার কিছুদিন পরে আমার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে মূর্চ্ছাবিধি প্রবর্ত্তনের কারণ এই যে মূর্চ্ছা পাক দিলে স্নেহে এমন একটা শক্তির সৃষ্টি হয় যে, সেই শক্তি প্রভাবে অতঃপর মূলোক্ত পাকের কাথ ও কল্কাদির গুণ সম্যক স্নেহে বর্ত্তাইতে পারে। আমি এই যুক্তির সারবত্তা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। উত্তরে আমার জিজ্ঞাস্য এই যোগবাহক শক্তি কি স্নেহের নিজস্ব সম্পত্তি না মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির অনুকম্পালব্ধ শক্তি মাত্র?

যদি বলা হয় ঘৃত তৈলাদি স্বভাবতই যোগ বাহী তাহা হইলে উপরোক্ত মূর্চ্ছাপাক সমর্থন সূচক যুক্তি অসারও ভিত্তিহীন ; আর যদি বলা হয় মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির দ্বারা স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি অথবা স্নেহের স্বাভাবিক যোগবাহক শক্তির অত্যধিক বৃদ্ধি হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই, মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির এমন কি শক্তি আছে, যদ্দ্বারা স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হইতে পারে? বৈজ্ঞানিক কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় কি? What is theoratically true may or may not be practically so, but what is theoratically false must be practically false. এমন কি অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে যদ্দ্বারা মূর্চ্ছা পাকে স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয় এই সত্য প্রমাণিত হইতে পারে? যুক্তি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না কার্য্যতঃ তাহা সত্য হওয়া অসম্ভব। আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত সমালোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে মূর্চ্ছা পাকে ক্ষেত্রবিশেষে মাত্রা বিপর্য্যয় জনিত দোষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে উপাদান বিপর্য্যয় জনিত দোষ ঘটাইয়া স্নেহের গুণহানি বা গুণ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে, সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বোক্তি ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপাদন না করা হইবে সে পর্য্যন্ত "মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয়" এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? আরও আমার পূর্ব্বোক্ত সমালোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে মূর্চ্ছা বিধি আধুনিক এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি প্রাচীন, সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য এই মূর্চ্ছা বিধি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি অথবা বৃদ্ধির অভাবে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অথবা কিঞ্চিৎ আধুনিক বাগভটাচার্য্য, চক্রপাণি দত্ত, শ্রীনিত্যনাথ শার্ঙ্গধর, শ্রীমিশ্রভাব প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণের প্রস্তুত ঘৃত তৈলাদি গুণহীন বা হীনগুণ হইত কি? যাহা হউক মূর্চ্ছা ক্রিয়াতে স্নেহে যোগবাহক শক্তির সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয় এই যুক্তি নিতান্তই অসার ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ঢাকা নিবাসী আমার কোন বন্ধু কবিরাজ আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে মূর্চ্ছা পাকে স্নেহে অধিক ফল লাভ হয় ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কথাটার প্রতিবাদ কল্পে কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। যাহা মাত্রা বিপর্য্যয় বা উপাদান বিপর্য্যয় জনিত দোষ ঘটাইয়া স্নেহের গুণহানি কারক বলিয়া Theoretically প্রমাণিত হইয়াছে তাহা practically কি প্রকারে সর্ব্বত্র স্নেহের গুণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে? যুক্তি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না কার্য্যতঃ তাহা সত্য হইতে পারে কি? স্নেহের গুণের তারতম্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে মূর্চ্ছা পাক বাদ দিয়া স্নেহপাক সাধন করিয়া এবং পক্ষান্তরে মূর্চ্ছা বিধির অনুসরণান্তে স্নেহ পাক সাধন করিয়া উভয় প্রকার স্নেহই একই অবস্থায় একই রোগীকে ব্যবহার করাইয়া ঔষধের গুণোৎকর্ষ পরীক্ষণীয়। এই পরীক্ষা ব্যাপার সহজ সাধ্য কি? সপ্ত-প্রকৃতি ভেদে

শারীর মানস দোষ ভেদে, আনূপ বা সাধারণ ও জাঙ্গলাদি দেশ ভেদে স্থৌল্য কৃশতাদি ভেদে বৈষম্য পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপ মানবদেহ বহুবিধ নয় কি? এমতাবস্থায় দুই চারি দশটী রোগীর উপর উভয় প্রকারে প্রস্তুত স্নেহ বিশেষের পরীক্ষা দ্বারা সোজাসুজি শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ঘৃত তৈলাদির সম্বন্ধে একটা universal সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তি সঙ্গত কি? পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজের নবাবিষ্কৃত ঔষধ ইঞ্জেকসন (Injection) প্রভৃতি পরীক্ষার্থ রাজশক্তির সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের হাসপাতালে ও অন্যান্য দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে লক্ষ লক্ষ রোগীর উপর পরীক্ষান্তে কোন কোন ঔষধের গুণ সম্বন্ধে সর্ব্বাদিসম্মত ক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না, আর আমরা কিনা দুই চারি দশজন রোগীকে ব্যবহার করিয়াই, ঔষধের ফল সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিয়া বা না করিয়াই উহার গুণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বসিয়া আছি। ইহা কি কম দুঃখের কথা? আমাদের উৎসাহদাতা কৈ, রাজশক্তির সাহায্য কৈ, অর্থ কৈ, দাতব্য চিকিৎসালয় কৈ, ঔষধ পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপ একই ব্যাধিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ রোগী কৈ? নাই বলিতে আমাদের কিছুই নাই! একজন কবিরাজের এক জীবনে স্নেহ প্রয়োগে চিকিৎসোপযোগী একই ব্যাধিগ্রস্ত রোগী কতজন পাওয়া সম্ভব। আর তাহাদের ভিতর কতজন রোগীর উপর বা উভয় প্রকারে স্নেহ প্রয়োগের প্রকৃষ্ট সুযোগ ঘটিয়া ঔষধের তারতম্য লক্ষিত হইতে পারে। শুধুই কি তাই। চিকিৎসকের নিস্বার্থ ভাবে আজীবন অদম্য উৎসাহের সহিত উল্লিখিত রূপে পরীক্ষা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঔষধের উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করা সহজ সাধ্য বা সম্ভবপর কি? পরীক্ষা ক্ষেত্রে আরও এক বিষম সমস্যা এইযে উভয় স্নেহ একই দিনে সময় ভেদে প্রয়োগ করিলে অথবা পর্য্যায়ক্রমে কিছুদিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করিলে কোন্ স্নেহ অধিক ফলপ্রদ হইতেছে তাহার অনুমানও সহজ সাধ্য কি? একটী মাত্র ঔষধের ক্রিয়া ব্যাধি বিশেষে পরীক্ষা করা সহজ সাধ্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু একই ব্যাধিতে প্রায় একই প্রকারের দুইটী ঔষধের গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করা যে কি কঠিন ব্যাপার এবং কতদূর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিলে "মূর্চ্ছা পাকে স্নেহে অধিক ফল লাভ হয়" সোজাসুজি এই universal সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের মত চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক নয় কি?

১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসের "আয়ুর্ব্বেদে প্রকাশিত মৎকৃত সমালোচনার একস্থানে টিপ্পনীর উল্লেখ দেখিলাম সুতরাং সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। "আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈল সমূহ বিলাসের সামগ্রী নহে, কাজেই উহার গন্ধবর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই "আমার এই উক্তি "যদা ফোনাদ্গম স্তৈলে ফেন শান্তিশ্চ সর্পিষি, গন্ধবর্ণ রসোৎপত্তিঃ স্নেহ সিদ্ধিস্তদা ভবেৎ॥" শার্ঙ্গধরোক্ত এই পরিভাষিক শ্লোকের বিরোধী বলিয়া টিপ্পনী করা হইয়াছে, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই—আমার পূর্ব্বলিখিত বাক্য কোন অংশে স্নেহ পাক সিদ্ধি সূচক শার্ঙ্গধরের পূর্ব্বোক্ত পরিভাষিক বিধির কোনই বিরোধী হয় নাই। কারণ, বর্ণগন্ধ রসোৎপত্তি স্নেহ পাক সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও তাই বলিয়া মূর্চ্ছা পাক দ্বারা তৈলকে

অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া এবং গন্ধ পাক দ্বারা সুগন্ধের উৎপাদন করিয়া যে স্নেহ পাক সিদ্ধি পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার অর্থ কি? যে সমস্ত স্নেহের গন্ধপাক নাই তাহাদের কি গন্ধবর্ণ রসোৎপত্তি হয় না? আমার উক্তির "উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হওয়া" এই বাক্যাংশটী বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। "গন্ধবর্ণের উৎপাদন" আর পাকে স্বাভাবিক ভাবে "বর্ণগন্ধের উৎপত্তি" এক কথা নয়, মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক দ্বারা বর্ণ ও গন্ধের উৎপাদন না করিলে কি শাস্ত্রোক্ত মূল পাক হইতে গন্ধবর্ণ রসোৎপত্তি হয় না, এবং তদ্দ্বারাই কি স্নেহ পাক সিদ্ধি নির্ণয় করা যায় না, যে শার্ঙ্গধরের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাঁহার গ্রন্থে কিন্তু মূর্চ্ছা বা গন্ধ পাকের নাম গন্ধও নাই। যাহাহউক গন্ধপাক সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গেই উক্তবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং যেহেতু মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক দ্বারা যথাক্রমে বর্ণ ও গন্ধের উৎপাদন করতঃ স্নেহ পাক সিদ্ধি নির্ণীত না হইয়া ক্বাথ ও কল্ক দ্রব্যাদির সহিত পক্ক হইয়া তৈলে যে স্বাভাবিক গন্ধবর্ণের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে তদ্দ্বারাই স্নেহপাক সিদ্ধি নির্ণেয় সুতরাং আমার উক্তি অযৌক্তিক বা উক্ত পারিভাষিক বিধির কিছুমাত্র বিরোধী হয় নাই।

অতঃপর উপসংহারে বক্তব্য মৎকৃত মূর্চ্ছা ও গন্ধপাকের প্রতিবাদ সূচক সমালোচনা আমার পরিচিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এবং কতিপয় বিখ্যাত ঔষধালয়ের অধ্যক্ষগণ বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছেন। মূর্চ্ছা ও গন্ধপাকে স্নেহের গুণোৎকর্ষ হইবে না পক্ষান্তরে ক্ষেত্রবিশেষে গুণহানি অথচ পাকের ব্যয় বাহুল্য মাত্র ঘটিবে, আবার অন্যপক্ষে মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধের গন্ধবর্ণের পার্থক্য লক্ষিত হইলে সাধারণে ঔষধের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে এই সমস্ত ভাবিয়া বড়ই ইতস্ততঃ চলিতেছে। তাই এই সমস্যা ভঞ্জনের জন্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কৃতবিদ্য কবিরাজ মণ্ডলী সত্বর পথ প্রদর্শন না করিয়া নীরবে থাকিলে আমার একমাত্র অরণ্যেরোদন সার হইবে না কি? আমরা সকলেই নিরবে থাকিলে প্রক্ষেপ জালে জর্জ্জরিত বার্দ্ধক্যনিপীড়িত, বিকৃত লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান রসায়নসেবী বৃদ্ধের ন্যায় নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমোন্নতিশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানাদির সঙ্গে সঙ্গে সদর্পে অগ্রসর হইয়া আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবেত? কালক্রমে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া সাধারণের চক্ষে নিতান্ত অবহেলার পাত্র হইয়া দাঁড়াইবে না তো? কথা প্রসঙ্গে আরও একটী কথা মনে পড়িয়াগেল। আমার এক বন্ধু অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষের অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া দোহাই দিয়া বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদে প্রক্ষেপের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে বাদানুবাদ দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে না করিয়া পাঠকগণকে আমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণের জন্য শ্রীমৎ চক্রপান দত্ত কৃত চক্রদত্ত নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে যাহাতে প্রক্ষেপে দোষ না ঘটে তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের শেষ ভাগে যে লিখিয়াছেন, 'যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগানন্যৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধবেদ্ধা। ভট্টত্রয়ত্রিপথবেদবিদা জনেন দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ॥" এই অংশ টুকু উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই আমার মত যদি ভ্রান্ত হয় তবে সত্বর তাহা সমালোচনা দ্বারা প্রতিপাদন করা হউক। আর যদি আমি এ বিষয়ে অভ্রান্ত হই তবে আমার একান্ত অনুরোধ আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই অগ্রসর হউন এবং সত্বর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমস্যার সমাধান দ্বারা পবিত্র আয়ুর্ব্বেদের মুখোজ্জ্বল করুণ। শুভমস্তু।

প্রবন্ধের অনেক স্থলে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। আং সং

আয়ুর্ব্বেদে নপুংসক ছাগ।

[কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিরঞ্জন]

(সমালোচনা)

—০:*:০—

বাল্যকাল হইতেই শুনি নপুংসক না কি অযাত্রা! যে কোন শুভ কর্ম্মারম্ভে বা কার্য্য বিশেষে গমনাগমনাদি ব্যাপারে নপুংসক দর্শন বা তৎসম্বন্ধে শ্রবণ ও পঠনাদিতে না কি সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ড ও নিষ্ফল হয়। মহাভারতে শুনি, মহাবীর ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দ্রুপদরাজের নপুংসক পুত্র শিখণ্ডিকে দেখিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়া না কি পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার ভয় হয় আয়ুর্ব্বেদে নপুংসক ছাগ ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিব, তাহা নিষ্ফল ও পণ্ড শ্রম না হয়। যাহার দর্শন, শ্রবণ পঠনাদিতে অশুভ সূচিত করে, বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজের নিকট তাহার এত সমাদর কেন? দেশে পালে পালে বিশুদ্ধ হৃষ্টপুষ্ট নিরোগ যুবা পাঠা ছাগী সুলভ হইলেও কবিরাজগণ আজন্ম ক্লৈব্যরোগগ্রস্ত নপুংসক ছাগের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া অজস্র অর্থ ব্যয়ে কৃতসঙ্কল্প কেন? রোগীর রোগশান্তির জন্য? কেন, ব্যাপার মন্দ নয়! রোগীর রোগ বিমোচন যে শুভ কর্ম্ম! সেই শুভকর্ম্মে অশুভসূচক নপুংসক ছাগঘটিত ঘৃত তৈলাদি প্রয়োগে শুভফল ফলিবে তো? নপুংসক ছাগ মাংসঘটিত অমৃতপ্রাশ ঘৃত ব্যবহারে রোগীর ক্লৈব্যাপনোদন হইবে তো? নিশ্চয়ই হইবে, নপুংসকের প্রয়োগে নপুংসকত্ব বিদূরীত হইবে। কারণ বিষে বিষ নষ্ট করে। প্রমাণ যথা;—বিষস্য বিষমৌষধম্। এ কেবল ডাক্তারী Principle পর, কবিরাজী Principleও বটে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কেবল সেদিন হইতে ইঞ্জেকসন (Injection) প্রভৃতির বেলা ঐ Principle অনুসরণ করিতেছেন, আর আমরা খাবার ঔষধে পর্য্যন্ত ঐ Principle বহুকাল যাবৎ বেশ সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ব্যবস্থা মন্দ নয়। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির চিহ্নই বটে, কিন্তু কথা কি, things are not what they seem. আমরা যা বুঝি, সর্ব্বত্র ঠিক তা নয়। নপুংসকের এবম্বিধ ব্যবহার মাকাল ফল বা বিষকুম্ভপয়োমুখ সাজিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যের মোহে বহুকাল যাবৎ পবিত্র আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়। স্বয়ং কাশীরাজ ধন্বন্তরী অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার প্রমান গোবিন্দ সেন কৃত পরিভাষা প্রদীপে আছে যথা:—

"পক্তব্যমাষামাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ। হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ॥ বলিনঞ্চ বয়ঃস্থঞ্চ সুবীর্য্যঞ্চ সুদেহিনম্। ন বৃদ্ধঞ্চ ন বালঞ্চ অবীর্য্যং স্রাবশোণিতম্॥ শৃগালবর্হিণোঃ পাকে

পুমাংসাং তত্র দাপয়েৎ। ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্য-হীনা স্বভাবতঃ। কাশীরাজমতেনৈব ছাগমেব নপুংসকম্॥ অভাবাদপ্রতীক্ষ্যা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ। বন্ধ্যা ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ॥" অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদির পাকে স্ত্রী পুরুষ ছাগ পরিত্যাগ করিয়া বলবান পূর্ণবয়স্ক, বীর্য্যবান এবং সুদেহ (পূর্ণাঙ্গ) নপুংসক ছাগ দিবে। বৃদ্ধ, শিশু, বীর্য্যহীন, ঋতুশোণিত স্রাব বিশিষ্ট (অবশ্যই বন্ধ্যা ছাগীর স্থলেই কেবল বুঝিতে হইবে) ছাগ গ্রহণ করিবে না। ময়ূরী, জম্বুকী, ছাগী, ইহারা স্বভাবতই বীর্য্যহীনা সুতরাং স্নেহপাকে শৃগাল ও ময়ূরের পুরুষ জাতী এবং কাশী-রাজের মতানুসারে নপুংসক ছাগ গ্রহণ করিবে। নপুংসক ছাগ না পাইলে এবং অপেক্ষা করিয়ার ও সময় না থাকিলে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ শাস্ত্রানুযায়ী না হইলেও বন্ধ্যাছাগী গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।" কথা গুলি সাধারণের চক্ষে নির্দ্দোষ যুক্তিযুক্ত ও বড়ই মুলায়েম বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। পরিভাষার পাঠ হইতে স্থূলতঃ দেখা যায় যে কাশীরাজ ধন্বন্তরী নপুংসক ছাগ ব্যবহারার্থ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু কাশীরাজ ধন্বন্তরী—"সুশ্রুত" বক্তা। বর্ত্তমান "সুশ্রুত সংহিতা" কাশীরাজ দিবদাস ধন্বন্তরীর উপদিষ্ট এবং তদীয় শিষ্য মহর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতায় কিন্তু নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধান দেখি না। উহাতে "স্ত্রীয়শ্চতুষ্পাদষু পুমাংসোবিহঙ্গেষু, মহাশরীরেষ্বল্প শরীরা, অল্প শরীরেষু মহাশরীরা প্রধানতা" এই উক্তি হইতে চতুষ্পদের মধ্যে স্ত্রীজাতি এবং বিহঙ্গের মধ্যে পুরুষ জাতির মাংস শ্রেষ্টতম বলিয়া সর্ব্বপ্রাণি সম্বন্ধে সাধারণ উক্তি দেখা যায়। সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত সাধারণ উক্তি ভিন্ন ছাগ সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ উক্তি নাই। যদি নপুংসক ছাগের ব্যবহার কাশীরাজের অভিপ্রেত হইত তবে নিশ্চয় তিনি মহর্ষি সুশ্রুতকে তদনুসারে উপদেশ দিতেন এবং সুশ্রুত সংহিতায়ও আমরা উহা লিপিবদ্ধ দেখিতাম। সুশ্রুত টীকাকার ডল্লনাচার্য্যও নপুংসক ছাগ ব্যবহারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই কেন? যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুত সংহিতা বিরচিত হইয়া-ছিল, সেই সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত হাতের লেখা গ্রন্থই প্রচলিত ছিল, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র সেদিন, সুতরাং মধ্যযুগে আর্য্য জাতির অধঃপতনের প্রবলবন্যায় হয়তো লিপি-কর ভ্রম প্রমাদ বশতঃ সুশ্রুত সংহিতার নপুংশক ছাগ ব্যবহার্থ উপদেশমূলক অংশটুকু ভাসাইয়া দেওয়ায় উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রশ্নে উত্তর আমার বক্তব্য এই যদি তাহাই হয় তবে মধ্য-যুগের অবনতির পূর্ব্ববর্ত্তীকালে আবির্ভূত মহামতি শ্রীমৎ বাগভটাচার্য্য আত্রেয় ও ধন্বন্তরী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সংহিতা-বলী মন্থন করিয়া যে "অষ্টাঙ্গহৃদয়" নামক অমৃতময় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে নপুংশক ছাগ ব্যবহারের অনুশাসন নাই কেন? উক্ত গ্রন্থপ্রণয়নে সুশ্রুত সংহিতা ও ও শ্রীমৎ বাগভটাচার্য্যের একটী প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকিবে। এমতাবাস্থায় যদি প্রাচীন সুশ্রুতে নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধান থাকিত তবে শ্রীমৎ বাগভটাচার্য্য নিশ্চয়

উহা স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিতেন, শ্রীমিশ্রভাব বিরচিত ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থখানিও পূর্ব্বতন সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং প্রামাণ্যই বলিতে হইবে। সেই গ্রন্থেও নপুংসক ছাগের বিধান নাই কেন? চরকটীকাকার চক্রপাণি দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত "চক্রদত্ত" নামক সংগ্রহ গ্রন্থে বাত ব্যাধি অধিকারোক্ত "ছাগলাদ্য ঘৃত" "মহামাস তৈল" প্রভৃতি এবং উহাদের টীকাতে নপুংসক ছাগ ব্যবহার সম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই। যদি উহা কাশীরাজের অভিপ্রেত হইত তবে চক্রপাণি দত্ত এবং চক্রদত্ত টীকাকার শিবদাস সেঠের উক্তিতে উহা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইতাম। শ্রীমৎ সিদ্ধ নিত্যনাথ কৃত "রসরত্নাকর" নামক গ্রন্থে কিরূপ ছাগ গ্রাহ্য তৎ সম্বন্ধে লিখিত আছে "নাতি বালা ন সূতচে ন বৃদ্ধা ন চ রোগিণী। মধ্যস্থা তরুণী গ্রাহ্যা কৃষ্ণা বৃষা বিশেষতঃ॥" তাঁহার এই উক্তি সুশ্রুতমতের প্রতিধ্বনি মাত্র। মহামতি শার্ঙ্গধর বিরচিত "শার্ঙ্গধর" নামক গ্রন্থে "মাষাদি তৈলে" ছাগমাংসের ব্যবহার দেখিতে পাই। গ্রন্থে প্রয়োজনানুসারে বহু বহু পারিভাষিক বিধির উল্লেখ করিয়া ছাগমাংস গ্রহণে নপুংসক ছাগর মাংস গ্রহণীর এরূপ একটী অসাধন মূলক শ্লোক দ্বিতীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না করা কি মহামতি শার্ঙ্গধর মহাশয়ের ভ্রম? এই রূপ অনুধাবন করিলে করিলে দেখা যায় যে সুশ্রুত সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কোন প্রামাণ্য গ্রন্থেই নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধান নাই। এমতাবস্থায় এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই নপুংসক ছাগের ব্যবহার হে কাশীরাজের অভিপ্রেত একথানা পরিভাষা রচয়িতা কোথায় পাইলেন তিনি বর্ত্তমান জীবিত থাকিলে উহা স্বপ্নে আদেশ হইয়াছিল কিনা সে প্রশ্নেরও মিমাংসা করিয়া লওয়ার সুবিধা হইত। "যার বাড়ী বিয়ে সে জানেনা পাড়পড়শি বল্‌ছে ও দের বাড়ী বিয়ে" এ ব্যাপারটীও তদ্রূপই দাঁড়াইল কি? বুদ্ধিমান পাঠক এক্ষণে বিচার করুণ যে "কাশীরাজ মতেনৈব ছাগমেব নপুংসকং" এই উক্তি কতদূর সত্য! আর যদি কেহ বলেন যে এই কাশীরাজ স্বয়ং দিবদাস ধন্বন্তরী নহেন, তিনি অন্য কোন কৃতবিদ্য চিকিৎসক হইবেন। যদি তাহাই হয় তবে এক কথায় সর্ব্ব গোল মিটিয়া যায়। রাজা থাকিতে কাতোয়ালের দোহাই দেওয়া আর চরক সুশ্রুত বাগভটাদি মনিষিগণের মত পায়ে ঠেলিয়া মধ্যযুগের অন্ধকারময় সময়ে আবির্ভূত কাশীরাজ ভট্টাচার্য্য বা কাশীরাজ সেন গুপ্ত নামক কোন রাজ বৈদ্যের মতানুসারে বিনা বিচারে মানিয়া লওয়া একই কথা। যাহা হউক এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে বিনা আপত্তিতে নপুংসক ছাগ ব্যবহারের বিধি প্রচলিত করিবার জন্য কাশীরাজের দোহাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিভাষা মধ্যযুগে কোন বৈদ্য কর্ত্তৃক কল্পিত এবং শ্লোকাকারে রচিত হইয়াছিল এবং কালক্রমে উহা পরিভাষা প্রদীপ নামক সংগ্রহ গ্রন্থে গোবিন্দ সেন স্বয়ং টীকা করিয়া উহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

পরিভাষা রচয়িতা কেবল কাশীরাজের দোহাই দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই পরে আরও লিখিয়াছেন, "অভাবাদপ্রতিক্ষাবা বৃদ্ধ বৈদ্যো-

পদেশতঃ। বন্ধ্যাছাগী বিপক্ষ্যানতু শাস্ত্রমতং চরেৎ" ॥ এই কথা হইতে পাঠক মহাশয় আরও একটী মজা দেখুন। "নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ" এই বাক্য দ্বারা তিতি প্রতিপাদন করিতেছেন যে "কাশীরাজ মতেনৈব ছাগমেব নপুংসকং" তাঁহার এই উক্তি যেন কতই না শাস্ত্র সঙ্গত উক্তি; আর বন্ধ্যাছাগীর ব্যবহার শাস্ত্রসঙ্গত না হইলেও বৃদ্ধ বৈদ্য মতানুযায়ী। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কাশীরাজের দোহাই দিয়া নপুংসক ছাগের ব্যবহার, শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার বলিয়া প্রতিপাদন করিতে কি সুন্দর ভাষাগত কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

গ্রন্থগত প্রমানাদি দ্বারা সপ্রমাণিত হইল যে ঘৃত তৈলাদির পাকে বর্ত্তমানে যে নপুংসক ছাগ মাংস ব্যবহৃত হয় তাহা কাশীরাজের অভিপ্রেত নহে। কাজেই এক্ষণে বিচার্য্য এই ঘৃত তৈলাদির পাকে নপুংসক ছাগ, বন্ধ্যা ছাগী, পাঠা, কৃতক্লীবছাগ (খাসী) এবং ছাগী ইহাদের মধ্যে কোন জাতির ব্যবহার সমিচীন? অনেকেই হয়তো বলিবেন নপুংসক ছাগের ব্যবহার কাশীরাজের মতানুযায়ী না হইলেও বহুকাল যাবৎ বৃদ্ধ বৈদ্য ব্যবহার সিদ্ধ বলিয়া উহাই প্রশস্ত। কথাটী বড়ই গুরুতর হইয়া পড়িল। প্রথমেই আমার জিজ্ঞাস্য, বৃদ্ধ বৈদ্য কাহারা? শ্রীমৎ বাগ্‌ভট্টাচার্য্য চক্রপাণি দত্ত শাঙ্গধর, শ্রীমিশ্রভাব শ্রীমৎ সিদ্ধনিত্যানাথ, ডল্লনাচার্য্য, শিবদাস সেন প্রভৃতি মহামান্য চিকিৎসকগণ বৃদ্ধ বৈদ্য সংজ্ঞাভুক্ত নয় কি? কিন্তু কৈ, তাঁহারাতো নপুংসক ছাগ ব্যবহার করেন নাই? যদি কেহ বলেন, মধ্যযুগে আবির্ভূত বৃদ্ধ বৈদ্যগণের ব্যবহার সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতেই বা দোষ কি? কিন্তু মধ্যযুগে আর্য্য জাতির প্রবল অধঃপতন সময়ে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের আবির্ভাবই যে আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশের মূল কারণ একথা শিক্ষিত সম্প্রদায় একেবারে অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? কারণ তাঁহাদের সময়েই আয়ুর্ব্বেদের এত অধঃপতন, তাঁহাদের সময়েই প্রমাণ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলীর বিকৃতি; তাঁহাদের সময়েই বহু মূল্যবান গ্রন্থের লোপ, তাঁহাদের সময় হইতেই ব্যবহারিক অস্ত্রচিকিৎসার অপ্রচলন, তাঁহাদের সময় হইতেই নানারূপ অশাস্ত্রিয়, অযৌক্তিক কদভ্যাসের অবাধে প্রচলন; সুতরাং মধ্য যুগের বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বয়োবৃদ্ধ কি জ্ঞান বৃদ্ধ ছিলেন সে সম্বন্ধে মহাসংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কবিরাজদের ভিতর কেহ কেহ যেখানে বড় ঠেকাঠেকির ব্যাপার দেখেন সেখানেই বৃদ্ধবৈদ্য ব্যবহারের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করেন। আবার আরও একশ্রেণীর কবিরাজ আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যে যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ থাকিবে তাহাই অভ্রান্ত বেদবাক্য অথবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রণীত। তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক লেখার ক্ষমতা এক মাত্র স্বয়ং ভগবান অথবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ব্যতিত অন্য কাহারও ছিল না বা নাই। যাঁহারা এই রূপ অন্ধ বিশ্বাস লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমার কিছুই বলিবার নাই, তবে যাঁহারা প্রকৃতই সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদের জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যাহা হউক সাধারণ ছাগ মাংস অপেক্ষা

নপুংসক ছাগ মাংস শ্রেষ্ঠ কিসে? সোম গুণাত্মক শুক্র এবং আগ্নেয় রজঃ এতদুভয়ের সমভাগে মিলনে নপুংসকের সৃষ্টি, বিপরিত গুণ বিপরিত গুণের হ্রাস কারক বিধায় নপুংসক ছাগে শুক্র ও রজের যোগটী হীন যোগ নয় কি? পুরুষত্ব বিহীন মেদ রোগীর ন্যায় নপুংসক ছাগের মাংসে প্রচুর পরিমাণে মেদ ও মাংস স্নেহ বসা বিদ্যমান থাকায় উহার মাংস দেখিতে ও খাইতে সুশ্রী, কোমল ও বড়ই উপাদেয় বলিয়া যদি মাননীয় পরিভাষা রচয়িতা মহাশয় মোহিত হইয়া থাকেন তবে তিনি উহার নির্ব্বিবাদে সাধারণে ব্যবহারের জন্য স্বয়ং কাশীরাজ ধন্বন্তরীর দোহাই দিয়া বসিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি মোহবসে আকন্দের আটাকে খাঁটী দুগ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন তাই বলিয়া সকলেই যে সেই ভ্রমে পতিত হইবে তাহার অর্থ কি? ঔষধার্থ মাংস ব্যবহার্য্য, মেদ বা বসা নহে, তাঁহার একথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল কি? নপুংসক ছাগ বিকলাঙ্গ বলিয়া উহার রস রক্তাদি সপ্তধাতুর সুচারুরূপে অবাধ ক্রম বৃদ্ধি হয় কিনা কে বলিবে? উহার মাংস রস বীর্য্য বিপাকে যাহাই কেন না হউক কিন্তু তাহার প্রভাব কি? নপুংসকে শুক্র ও রজের মধ্যে কোন ধাতুরই প্রাধান্য নাই কাজেই উহার কি পুরুষোচিত কি স্ত্রীজনোচিত উভয় প্রকারের কাম বেগাদি জনক প্রভাব নাই, সুতরাং বাজীকরণ ও অপত্যজনকত্বাদি প্রভাব না থাকায় উহা সাধারণ ছাগ মাংস অপেক্ষা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? যাঁহারা কথায় কথায় বৃদ্ধবৈদ্য ব্যবহারের দোহাই দিয়া বসেন তাঁহাদের এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিবার আছে কি? পরিভাষা প্রদীপে গোবিন্দ সেন কৃত টীকায়, "নন্বু বন্ধ্যায়া সপুংসকস্য চ ছাগস্য অপত্যজনকত্বং নাস্তি, তৎ কথমপত্য কামিনঃ প্রবর্ত্তন্তে ছাগাদি ত্বতাদিষু? কদাচিৎ ক্রিয়াসিদ্ধেরভাব স্যাদতশ্চিন্ত্যম্" এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে অপত্য জনকত্বাদি প্রভাব না থাকায় বন্ধ্যা ছাগী এবং নপুংসক ছাগ ব্যবহার যুক্তিযুক্তি কিনা সে সম্বন্ধে টীকাকার গোবিন্দ সেন মহাশয়ের ও সন্দেহ দাঁড়াইয়াছিল এবং এস্থলে ক্রিয়া সিদ্ধির অভাব হয় বলিয়া নপুংসক ছাগ ও বন্ধ্যাছাগী ব্যবহার্য্য কিনা সে বিষয় চিন্তনীয়, এই উক্তি করিয়াই এড়াইয়া গেলেন। গোবিন্দ সেন মহাশয় সম্ভবতঃ সরল বিশ্বাসে টীকা করিয়াছিলেন কাজেই নপুংসক ছাগের ব্যবহার প্রকৃতই কাশীরাজের অভিপ্রেত কিনা সে সম্বন্ধে তলাইয়া দেখেন নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস নপুংসক ছাগ সহজ ক্লৈব্য রোগগ্রস্ত, খাসী অভিঘাতজ ক্লৈব্য রোগগ্রস্ত; এবং বন্ধ্যা ছাগী বন্ধ্যারোগগ্রস্ত, এমতাবস্থায় সুশ্রুতোক্ত "কাস শ্বাস করং বৃদ্ধং ত্রিদোষং ব্যাধিদূষিতং" এই বাক্যানুসারে নপুংসক ছাগ, বন্ধ্যাছাগী ও খাসী ত্রিদোষ কারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আপত্তি কি? নপুংসক ও খাসীর মাংস অত্যন্ত চর্ব্বি যুক্ত কাজেই,—"মাংসং সদ্যোহতং শুদ্ধং বয়ঃস্থঞ্চ ভজেৎ, ত্যজেৎ। মৃতং কৃশং ভৃশং মেদ্যং ব্যাধিবারি বিষৈর্হতম্॥ বাগ্‌ভটাচার্য্যের এই উক্তির "ভৃশং মেদ্যং" শব্দদ্বারা উহা পরিত্যজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না কি? ভাবপ্রকাশে কৃতক্লীব ছাগ সম্বন্ধে লিখিত আছে,"মাংসাং নিঃকাসি-

তাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃতগুরু," এবং সাধারণ পাঠার মাংস সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"ছাগ মাংসং লঘু স্নিগ্ধং সাদু পাকং ত্রিদোষঘ্নং" ইহা হইতে ও প্রমাণিত হইতেছে যে খাসীর মাংস কফকারক ও গুরুপাক নিবন্ধন লঘুপাক ও ত্রিদোষ নাশক ছাগ মাংস অপেক্ষা নিকৃ। যাহা হউক যে কয়েকটী কথা উপরে লিখিলাম তাহা হইতেই আশা করি নপুংসক ছাগ খাসী ও বন্ধ্যাছাগী ঔষধার্থ ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়াই প্রমানিত হইয়াছে।

অতঃপর ঔষধে পাটার মাংস ব্যবহার্য্য কি ছাগীর মাংস ব্যবহার্য্য যে সম্বন্ধে বিচার্য্য সুশ্রুতোক্ত "স্ত্রিয়ং শ্চতুষ্পদেষু পুমাংসো বিহঙ্গেষু" ইত্যাদি বচনের এবং শ্রীনিতা নাথের রসরত্নাকরোক্ত "নাভিবালা নস্থতাচ" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের উপর নির্ভর করিয়া যিনি ছাগীর মাংস ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক তিনি করুণ, তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণ বশতঃ আমি সাধারণতঃ পাটার মাংস ব্যবহারের পক্ষপাতী। চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে সুশ্রুতে উক্তি দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় উহার মাংসের লঘুত্ব প্রযুক্তই হইয়া থাকিবে। বাগ্‌ভটোক্ত "লঘুর্ষোষিচ্চতুষ্পাৎসু বিহঙ্গেষু পুনঃ পুমান্" এই বচন হইতে উহাই যেন সত্য বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক সুশ্রুতোক্ত তদ্বিধ উক্তি সমুদয় চতুষ্পদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে কেবল ছাগ সম্বন্ধে কোন বিশেষ ভাবের উক্তি নাই। ভাগ্‌বটের অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে দেখা যায় "নাতিশীতং গুরুস্নিগ্ধং মাংসমাজমদোবলম্। শরীর ধাতু সামান্যদেন-ভিষ্যন্দি বৃংহণম্॥ অর্থাৎ ছাগমাংস অল্প শীতবীর্য্য, গুরু, অল্পস্নিগ্ধ এবং নির্দ্দোষ। ইহা মনুষ্য মাংসের তুল্যগুণ বিশিষ্ট বলিয়া মাংসবর্দ্ধক এবং অনভিষ্যান্দি। কেবল মাংস বিষয়ে তুল্যতা আছে এমন নহে ছাগ শরীরগত রস রক্তাদি অন্যান্য ধাতু সমূহও মনুষ্যশরীরস্থ রস রক্তাদি ধাতুর তুল্যগুণ বিশিষ্ট। বাগ্-ভটের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে পুরুষের সপ্তধাতু পাটার সপ্তধাতুর তুল্যগুণ বিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের সপ্তধাতু ছাগীর সপ্ত ধাতুর তুল্যগুণ বিশিষ্ট, সুতরাং পুরুষের ব্যবহারার্থ ঔষধ পাঠার মাংস দ্বারা এবং স্ত্রীলোকের ব্যবহারের জন্য ঔষধ ছাগীর মাংস দ্বারা প্রস্তুত করিলেই অধিকতর ফলদায়ক হইতে পারে কি? যাহা হউক নপুংসক ছাগ ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্য অবগত হওয়ার জন্য রাজসাহী নিবাসী সুশ্রুত টীককার মাননীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয়কে লিখিলে তিনি পোষ্টকার্ডে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশটুকুমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"যেমন বাসাখণ্ড কুষ্মাণ্ড প্রভৃতিতে পুরাতন কুষ্মাণ্ড দেওয়া প্রচলিত হইয়াছে তেমনি নপুংসক ছাগমাংস প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক প্রস্তুত করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেই প্রমাণ হয়, মুদ্রিত করিলেত বেদবাক্য, এই রূপে নপুংসক ছাগ প্রশস্ত হইয়াছে। আপনি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হৃষ্ট পুষ্ট যুবা পাঁঠার মাংস দিবেন। স্ত্রী মাংস দিবেন না"

কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণ কবিরাজ মহাশয়ের ব্যক্তিগত মন্তব্য আমরাই মতের পরিপোষক। যাহা হউক আমাদের দেশের বর্ত্তমান মাননীয় বৃদ্ধ মহোদয়গণ এ বিষয়ে কি বলেন শুনিতে বাসনা। অলমধিকেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলিকাতায় বসন্ত। কলিকাতায় ইহার মধ্যই বসন্ত রোগ দেখা গিয়াছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসে কয়েকটী ছাত্র বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে। আমরা ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটী বাড়ীতে বসন্তে আক্রান্ত রোগীর সংবাদ পাইয়াছি। সকলকেই এখন হইতে সাবধান হইতে বলিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।

হরনাথ সাধন সঙ্ঘের উদ্যোগে ১১নং নিয়োগী ঘাট ষ্ট্রীট বাগবাজারে শীঘ্রই একটা আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে।

হরনাথ অবৈতনিক পাঠশালা।

১১নং নিয়োগী ঘাট ষ্ট্রীটে হরনাথ অবৈতনিক পাঠশালা নামে একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। অস্পৃশ্য ও অশিক্ষিতদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাদান ও তাহাদের গ্রামে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার ঐ বিদ্যালয়ে উদ্দেশ্য প্রায় মাসখানিক হইল ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রায় ৮০ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে এই ধরণের বিদ্যালয় এই প্রথম। আমরা সকলকেই এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা সমিতি—গত ৯ই অগ্রহায়ণ রবিবার সন্ধ্যার সময় ৪৫, হারিসন রোডে কবিরাজ শ্রীযুত দুর্গাদাস ভট্ট এম, এ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সমিতির ৩য় অধিবেসন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুত অতুলবিহারী দত্ত বি·এস-সি কবিরত্ন মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদে অন্ন তত্ত্ব" সম্বন্ধে একটি সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভায় গণ্যমান্য, কবিরাজ, ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ৮টায় সভা ভঙ্গ হয়।

এই সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুত অতুল বিহারী একজন উদ্যোগী পুরুষ, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি·এস-সি উপাধিধারী। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের সেবা করিতেছেন। অতুল বিহারীকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইনি অতি অল্পদিনের মধ্যে চিকিৎসায় যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এই সমিতিরও তেমনি উন্নতি করিয়াছেন। ইহার যে তিনটী অধিবেশন হইয়াছে—তাহাতে কবিরাজ ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা শিক্ষাদাতা যেমন ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ ডি·লিট প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যেমন নূতন নূতন জ্ঞান দান করিতেছেন সেইরূপ অনেক নূতন বিষয়ও শিখিয়া যাইতেছেন। আমাদের মনে হয় শীঘ্রই এই সমিতি দেশের ও দশের সেবায় আসিবে। দেশে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এরূপ সভা সমিতি যত হয় ততই মঙ্গল।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, "গোবর্দ্ধন প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ } পৌষ ১৩৩০ সাল { ৪র্থ সংখ্যা।

চিকিৎসকের কথা।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

যা' যায়, তা' বুঝি আর আসে না, যেটি লুপ্ত হয়, তাহার স্থান বুঝি আর পূর্ণ হয় না, যেমনটি একবার হইয়াছিল, তেমনটি বুঝি আর কখন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সৃষ্টি রহস্যে জগতস্রষ্টার ইহাই বুঝি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা সৃষ্টি আরম্ভের প্রারম্ভ কাল হইতে সৃষ্টি জগতে চলিয়া আসিতেছে।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ—সকল বিষয়ের জ্ঞানগরিমায় ভারত একদিন যেমন সমুন্নত হইয়াছিল, এখন তাহার লুপ্ত স্মৃতিটী ভিন্ন আর তো কিছুই পড়িয়া নাই। সে ব্যাস-বাল্মীকি, সে মনু, পরাশর, সে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক, একদিন যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জাগতিক সকল প্রকার কর্ম্মে ভারতবাসীকে যেরূপ ধর্ম্ম-বিজড়িত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এখনকার দিনে স্বেচ্ছাচারভ্রষ্ট ধর্ম্মবিগর্হিত প্রাণ ভারতসন্তানগণকে উদ্ধার করিবার জন্য সেরূপ আর তো কেহই তাঁহাদিগের স্থান পূর্ণ করিলেন না! কালিদাস, ভবভূতির মত কাব্য ঝঙ্কারেই বা বর্ত্তমান যুগে কয়জনে শুনাইতে সমর্থ হইয়াছেন? খনা-লীলাবতীর মত জ্যোতিষশাস্ত্র প্রচারেও তো এখনকার দিনে আর কেহ উপস্থিত হইলেন না। সেইজন্যই মনে হয়, 'যা যায়, তা' বুঝি আর আসে না, যেটি লুপ্ত হয়, তাহার স্থান বুঝি আর পূর্ণ হয় না, যেমনটি ছিল, তেমনটি বুঝি আর কখন হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধেও সে ধন্বন্তরি দিবোদাস কতকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় আর কাজ নাই, প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের স্থানই বা এখনকার দিনে কয়জনে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন? নাড়ীজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসকের প্রধান কৃতিত্ব। এ কৃতিত্ব যাঁহার নাই, তিনি চিকিৎসা কার্য্যে কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন না, কিন্তু সে নাড়ী জ্ঞানটা বর্ত্তমান যুগে কয়জনের আছে, তাহা বলিতে পারি না। সে কালের নাড়ী জ্ঞানী চিকিৎসকদিগের কীর্ত্তিকাহিনী এখন যেন গল্পকথায় পরিণত হইয়াছে। ব্যঙ্গপরায়ণ সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি রঙ্গরহস্তে কৌতুক উপভোগের জন্য চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"মহাশয়! দেখুন দেখি, কেমন আছি! শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না।" নাড়ী জ্ঞানী চিকিৎসক নাড়ী দেখিয়া তাঁহার মনোভাব সমস্তই অবগত হইলেন। বলিলেন,—"এ রহস্য নয় বাপু, এখন তোমার কোন রোগই হয় নাই, এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছ, কিন্তু ছয় মাসের বেশী তোমার পরমায়ু নাই, ঠিক ছয় মাস পূর্ণ হইলে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সেজন্য এখন হইতে প্রস্তুত হও।" বাস্তবিক ঠিক ছয় মাস পরেই সেই ব্যঙ্গকারীর ইহলীলা শেষ হইল।

সেকালের চিকিৎসকদিগের জীবন কথা আলোচনা করিলে এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত অবগত হওয়া যায়। সেকালের মত মুষ্টিযোগ টোট্‌কাও বুঝি একালের চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থায় লোপ পাইয়াছে। সেকালে প্রায় সকল চিকিৎসকই অধিকাংশ স্থলে মুষ্টিযোগ ও টোটকায় রোগ সারাইতেন। তাহার ফলে লোকের অর্থ ব্যয়ও কম হইত, সহজে রোগও সারিত। এখন চিকিৎসকেরাও মুষ্টিযোগই পাচনের ব্যবস্থায় বিমুখ হইয়াছেন, গৃহস্থও সেরূপ ব্যবস্থায় পালনে অলস। কিন্তু এক এক একটা সামান্য সামান্য মুষ্টিযোগে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, অনেক সময় তাহার কাছে স্বর্ণ রৌপ্যাদিঘটিত অনেক ঔষধই হার মানিয়া থাকে। এই জন্যই সেকালের ঋষিকল্প চিকিৎসকদিগের অনেকে বড়িগুঁড়ার ব্যবস্থা ছাড়িয়া অধিকাংশ স্থলে এই পাচন মুষ্টিযোগেরই ব্যবস্থা করিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ "চরক" এই বনজ ঔষধ সমস্ত লইয়াই লিখিত। এখন অনেকে কথায় কথায় "চরকের" দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু "চরকের মতের চিকিৎসা একরূপ যে দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, ইহা বলিলে দোষ হইবে না।

যুগমাহাত্ম্যে চিকিৎসা কার্য্যটি এখন যেরূপ একটি প্রকাণ্ড ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, সেকালে এরূপ ছিল না। সেকালের সকল লোকেই ধর্ম্ম মানিয়া চলিত। অতি পাপাত্মা ভিন্ন সেকালে শাস্ত্রবাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতনা। ধর্ম্মবৎসলবৈদ্য শাস্ত্র নীতি পালনে তদ্গত প্রাণ হইতেন। রোগী দেখিবার সময় তাঁহারা মনে করিতেন,—

"নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্য বিক্রয়ম।
ঈশ্বারাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থস্তু বৃত্তয়ে॥"

অর্থাৎ সামান্য লোভপরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসা জনিত পুণ্য বিক্রয় করা উচিত নহে, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ রাজা ও ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট অর্থ অবশ্য গ্রহণীয়। একালে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। একালের বৈদ্য-চিকিৎসকের প্রতি লোকের ভক্তিও কমিয়াছে এইজন্য। বৈদ্যগণ এক একজন পুরা ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছেন। রোগ আরোগ্যের জন্য যেরূপ যত্ন লওয়া উচিত,

এখনকার অনেক চিকিৎসক তাহা লউন আর না লউন, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অনেকে যথেষ্ট যত্ন লইয়া থাকেন। সে কালে রোগীর বাটীতে আহূত হইলে বৈদ্য নাড়ী দেখিতেন, জিহ্বা পরীক্ষা করিতেন, মুখমণ্ডলের সকল টুকু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেন, মূত্র জনিত দোষ থাকিলে নূতন সরায় মূত্র ধরাইয়া সর্ষপ তৈল সংযোগে মূত্র পরীক্ষা করিতেন, রোগের পূর্ব্বকারণ অনুসন্ধান করিতেন, বর্ত্তমান অবস্থা ভাল করিয়া শ্রবণ করিতেন, এতগুলির তত্ত্ব লইয়া তাহার পর হয়তো একটী মুষ্টিযোগ—নয় তো পাচনের ব্যবস্থা করিতেন। শুধু ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, অনেক সময় খোন্তা কুড়ুল লইয়া নিজেই সে ব্যবস্থার ঔষধি সকল আহরণ করিয়া আনিতেন। সে আহরণও আবার যে-সে দিনে হইত না, শাস্ত্র বাক্য অনুযায়ী প্রশস্ত দিনে এবং প্রশস্ত স্থান হইতে সে সকল সংগ্রহ করা হইত। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সকল প্রয়োগেই অনেকে নির্ব্যাধি হইতেন। যখন সেরূপ চেষ্টার চিকিৎসক ব্যর্থমনোরথ হইতেন, তখন এখনকার মত পাঁচ সাত বারে পাঁচ সাত রকম নহে, একটা দুইটা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতেই রোগ সারিয়া যাইত। এখনকার মত সে সকল ঔষধ ষ্টপার ফায়েলে কাচের আলমারিতেও রক্ষিত হইত না, সকল ঔষধ তৈয়ার করা হইত কিনা তাহাও সন্দেহ; অনেক সময় ঔষধ তৈয়ার করিবার জন্য ফর্দ্দ দেওয়া হইত, যে সকল স্থলে তৈয়ারি ঔষধ বৈদ্যের ঘরে রক্ষিত হইত, তাহা হয় পুটলির ভিতর, নয় হাঁড়ি কলসীর মধ্যে থাকিত, এখন সেরূপ পুঁটলি বা হাঁড়ি কলসীর মধ্যে ঔষধ রাখিলে তো সে চিকিৎসক অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িবেন। যাহা হউক একালের চিকিৎসা বৃত্তিটা সে কালের সহিত তুলনায় দেশে একটা নূতন যুগ আনয়ন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—চিকিৎসা কার্য্যটা ব্যবসায়ের সামগ্রী নহে। জীবন-মরণ লইয়া যে বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহাকে ব্যবসায়ের সামগ্রী মনে করা তো অর্ব্বাচীন বুদ্ধির পরিচয় প্রদান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ও লম্বা লম্বা বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়া দোকান খুলিলেই তিনি চিকিৎসক! তা' তিনি শাস্ত্রজ্ঞানী এবং কর্ম্মকুশল চিকিৎসক হউন বা না হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না, জাঁকজমক করিয়া বসিতে পারিলেই তাঁহার দোকান চলিয়া যাইবে। দেশের এমনি দুর্গতি দাঁড়াইয়াছে; ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অধিকারী একমাত্র বৈদ্যগণই হইতেন, এখন আর তাহা নাই,—এখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অধিকারী হইয়াছেন! দুর্গতির কথা আর বলিব কি, এই আজগুবি সহর কলিকাতায় দু'চারি জন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার দোকান দৃষ্টিগোচর হইতেছে! যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অতি শুদ্ধভাবে এবং পবিত্র অন্তঃকরণে তিথি নক্ষত্র দেখিয়া প্রশস্ত স্থান হইতে উপাদান সকল সংগ্রহ করিয়া, শ্রীভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রস্তুত করিতে হয়, সেই সকল ঔষধ এখন আর্য্য-

জাতির আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে প্রস্তুত হইয়া অবলীলা ক্রমে জন সাধারণের উদরস্থ হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বৈদ্য জাতি ভিন্ন অন্য জাতির পাককরা ঔষধ সেবন করিলে যে ধর্ম্ম হানি হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যটিই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

অন্যজাতি কৃতঃ পাকোহস্পৃশ্য সর্ব্বজাতি ভিঃ। ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ। মোহাদ্দ্বিজাতি বর্ণাদ্যৈঃ পাচিতং খাদিতেসতি। প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥ অর্থাৎ অন্য জাতির পাককরা ঔষধ সর্ব্ব জাতির অস্পৃশ্য হইয়া থাকে, এইজন্য বুদ্ধমান ব্যক্তিগণ বৈদ্যকেই ঔষধ পাকে নিযুক্ত করিবেন। যদি মোহ কর্ত্তৃক অন্য জাতিতো পরের কথা—দ্বিজাতি গণেরও পাককরা ঔষধ সেবন করেন, তাহা হইলে শূদ্র প্রশয়শ্চিত করিবেন এবং দ্বিজাতি জাতিহীন হইবেন। পাঠকগণ এখন বুঝিলেন তো শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিলে তিন টাকার "চ্যবনপ্রাশ" এবং চারিটাকায় 'শ্রীমদনানান্দ মোদক" সেবনের জন্য বিজ্ঞাপনের বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া জাতিধর্ম্ম রসাতলে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক অনেক কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাটি এখন একটী প্রকাণ্ড ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। একালের অনেক বৈদ্য সন্তান সেকালের রীতি পদ্ধতি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ মুখে গোঁড়ামি এবং ভণ্ডামিটি খুবই করিয়া থাকেন। নাড়ী ধরিয়া রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা নাই, অথচ ডাক্তারদিগের থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের প্রয়োগ দেখিলে নিন্দা করিবেন। বক্ষ পরীক্ষার ক্ষমতা নাই কারণ নাড়ীজ্ঞান না থাকিলে বক্ষ পরীক্ষাতো হইতে পারেনা, সে অবস্থায় ডাক্তারদের ষ্টেথেস্কোপ লইতে দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। বস্তিক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ কাচের পিচকারীর নিন্দা শতমুখে বাহির করিবেন। অনেক চিকিৎসকের অবস্থাই এখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমরা অবশ্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া ডাক্তারি মত ঢুকাইয়া লও—একথা বলিতেছিনা। সেকালের মত নাড়ীজ্ঞানী হইয়া শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ব্রত গ্রহণ কর, ইহাই আমরা বলিব। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে তাহার অভাব রহিয়াছে, অথচ চিকিৎসকের সাজে সজ্জিত হইয়া জীবন মরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বসিয়াছ, সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ কতকটা সিদ্ধান্তও করিবার জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসক-দিগের পন্থা অনুসরণ করা তো অকর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বাপেক্ষা চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে ত কথাই নাই। তাহাতে ইহকালে অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে কিছু ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরকালের পথ কলুষিত করা হইবে না। দেশের দশের ক্ষতির কারণ জন্মাইয়াও সমাজকে বিধ্বস্ত করা হইবে না।

দন্তরোগের মুষ্টিযোগ।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

আজ কাল অনেকেই দাঁতের অসুখে কষ্ট পাইয়া থাকেন, নিম্নের মুষ্টিযোগ কয়টি ব্যবহারে দাঁতের পোকা, অকালে দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়ায় ও মাড়ীতে ঘা হওয়া, রক্ত পড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগের যন্ত্রণা হইতে তাঁহার উপকার পাইবেন।

১। ভেঁটগাছের শিকড় ২ ভরি ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ⁄।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ জলে কুল্লী করিলে দাঁতের বেদনা রক্তপড়া, দাঁতের মাড়িফোলা ও দাঁতনড়া প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গের উপশম হয়। ভেঁটগাছ দুইপ্রকার, তন্মধ্যে যে ভেঁটের ফুল বেল ফুলের ন্যায় অনেক পাঁপড়ী যুক্ত হয়, সেই ভেঁটের শিকড় গ্রহণ করিবে। পরীক্ষিত।

২। কলাগাছের মূলসহ খোলসাদি ২ ভরি, ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ⁄।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ জলে কুল্লী করিলে দন্তরোগের আশু যন্ত্রণা নিবারিত হয়। পরীক্ষিত।

৩। রাংচিতার আটা দন্ত বেদনার স্থানে লাগাইবে কিম্বা ডাঁটা দ্বারা দাঁতন বা উহার ডাঁটা ১৫ মিনিট কাল চর্ব্বণ করিবে, এইরূপ সপ্তাহ কাল করিলে যাবতীয় দন্তরোগের উপশম হয়। পরীক্ষিত।

৪। দেবদারু পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দ্বারা কুল্লি করিলে দাঁতের গোড়ার যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পরীক্ষিত।

৫। ডাবের জল গরম করিয়া কিঞ্চিৎ ফটকিরী চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দ্বারা বারংবার কুল্লী করিলে দাঁতের গোড়ার ফুলা ও যন্ত্রণা সত্বর নিবারিত হয়।

৬। দন্তমূল ফুলিয়া কট্ কট্ ঝম্ ঝম্ করিতে থাকিলে লঙ্কাসিজ (জটালঙ্কা) ২০ তোলা, কুচি কুচি করিয়া মাটীর হাঁড়িতে ⁄২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে ⁄॥০ সের থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরীর গুঁড়া দিয়া ঈষৎ গরম গরম বারংবার কুল্লী করিলে সঙ্গে সঙ্গে যাতনার শান্তি হইবে। কুলকুচা করিবার সময়ে ইহার জল যাহাতে পেটের ভিতর না যায় তদ্বিষয়ে সাবধান হইবেন—কারণ ইহাতে পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা।

৬। বীজছাড়ান হরিতকী ভস্ম ৪ তোলা, কচিসুপারি ভস্ম ৪ তোলা, হিংলিদোক্তা তামাক পোড়া চূর্ণ ২ তোলা, ফট্‌কিরী চূর্ণ ১ তোলা। কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া নিত্য দাঁত মাজিলে নড়াদন্ত ও বসিয়া যাইবে, কখনও দাঁত নড়িবেনা বা কোনও প্রকার দন্তপীড়া হইবে না।

৮। নারিকেল মালা পোড়ান কয়লা, ফট্‌কিরী পোড়ান খই ও ঘেঁচিকড়ি পোড়ান

ভস্ম প্রত্যেকটী সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে এবং ঐ গুঁড়ার দ্বারা প্রত্যহ দাঁত মাজিলে দন্ত নড়া, ফোলা, বেদনা প্রভৃতি যাবতীয় কষ্ট দূরীভূত হইবে। পরীক্ষিত।

৯। ফট্‌কিরী এক তোলা, মোচরস আধতোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহার দ্বারা কুল্লী করিলে দাঁতের বেদনা নিবারিত হয়।

১০। হরীতকী দগ্ধ ভস্ম, দগ্ধ তুতিয়া ভস্ম ও কাঁচা হিরাকস—সমপরিমাণ একত্র করিয়া উহার দ্বারা দন্ত মাজিলে দন্তনড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ আরোগ্য হয়।

১১। জাঙ্গীহরীতকি ৫।৬ টা, কালজীরা একছটাক ও ফট্‌কিরী অর্দ্ধছটাক এই গুলি চূর্ণ করতঃ উহার দ্বারা দন্ত মাজিলে যাবতীয় দন্ত রোগের উপশম হয়।

১২। কুচিলা একটা জ্বালাইয়া ধূম রহিত হইলে পেষণ করিয়া বেদনার স্থানে লাগাইয়া দিলে বেদনার উপশম হয়।

১৩। পাঁপ্‌ড়ি খদির, মুসব্বর, তুঁতে ও কর্পূর সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ যেখানে ফুলিয়াছে সেই স্থানে লাগাইলে সত্বর যন্ত্রণার উপশম হয়।

১৪। ত্রিফলার জলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া ঐ জলে কুল্লী করিলে দন্তমাড়ি ফোলা ও ঘা সত্বর আরোগ্য হয়।

১৫। বকুল ছাল সিদ্ধ করিয়া তাহার কুল্লী করিলে দন্তমূল দৃঢ় হয়। ইহার অপক্ক ফল চর্ব্বণ করিলে শিথিল দন্ত দৃঢ় হয়।

১৬। বচ ও তিল চর্ব্বণ করিলে দন্ত ফোলা ও বেদনা নিবারণ হয়।

১৭। কণ্টকারীর ফল দগ্ধ করিয়া সেই ধূম দন্তে লাগাইলে দন্ত-ক্ষয় জনিত বেদনা নিবারণ হয়।

১৮। কৃমীমস্তকী চর্ব্বণ করিলে, মাড়ী ও দন্তের শিথিলতা নিবারণ হয়।

১৯। বড় পানার শিকড় বাটিয়া উহার সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দন্তের উপর প্রলেপ দিলে, দাঁতের পোকা মরিয়া যায়।

২০। আকরকরা বচ, হীরাকষ পোড়া ও বিটলবণ চূর্ণ করিয়া দাঁতের মাড়িতে টিপিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

২১। পাঁপড়ি খয়ের ২ ভাগ, গোলমরিচ ১ ভাগ, কর্পূর ।০ আনা, তুঁতেপোড়া ।০ আনা, উপরিউক্ত দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া পোকাধরা দন্তের গোড়ায় টিপিয়া লাগাইলে নিশ্চয় উপকার হইবে।

২২। দাঁতের গোড়ায় পোকা হইলে কানেড়া গাছের শিকড় কর্ণে বাঁধিলে দন্তের পোকা বিনষ্ট হয়।

২৩। মনসাসিজের শিকড় চিবাইলে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

২৪। আপাং শিকড় চিবাইয়া হুঁকার কটু জলে কুলকুচা করিলে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

২৫। যে কোন কলার বাকনা পচা জলে ধুইয়া পোকা খাওয়া দাঁতে বসাইয়া দিলে দাঁতের পোকা মরিয় যায়।

২৬। দাঁতের গোড়ায় পোকায় খাইয়া ছিদ্র করিলে ঐ দাঁত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে, পরে কর্পূর ও আফিং সমপরিমাণে মিশ্রিত করতঃ বটীকা প্রস্তুত করিয়া ক্ষয়িত দাঁতের মধ্যে টিপিয়া দিবে।

তাহাহইলে দাঁতের পোকা মরিয়া যাইবে ও দন্ত বেদনা দূরীভূত হইবে।

২৭। আকরকরা বচ ১ ভাগ, নিশাদল ৩ ভাগ, আফিং ৫ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করতঃ বটীকা প্রস্তুত করিয়া দাঁতের গোড়ার ছিদ্রে পূরণ করিয়া দিবে, ইহাতে দাঁতের পোকা বাহির হইবে ও বেদনার উপশম হইবে।

২৮। লবঙ্গ তৈল, দারুচিন তৈল, স্পিরীট ক্যাম্ফার ইহার মধ্যে যে কোনটী তুলায় করিয়া ক্ষয়িত দাঁতের উপর লাগাইয়া দিলে দন্ত বেদনার উপশম হয় ও পোকা বর্হিগত হইয়া যায়।

২৯। দাঁতের বেদনা ও মাড়িফোলায় ছোট পেঁয়াজ ও কালজীরা সমপরিমাণে লইয়া কল্কেতে তামাকের ন্যায় সাজিয়া উহার ধূমপান করিবে। এই ধূমপান প্রত্যহ ৩।৪ বার করিবে—যাহাতে মুখ হইতে অতিমাত্রায় লালা নিঃসরণ হয়। এইরূপ করিলে দাঁতের যাবতীয় উপসর্গ নিবারণ হইবে।

৩০। উর্দ্ধশ্লেষ্মা বশতঃ দন্তবেদনা ও দন্তমাড়ি শিথিল হইলে কাকমাচী, কালাদানা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক সমপরিমাণে জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহাদ্বারা কুল্লী করিলে দন্তের বেদনা নিবারণ হয়।

৩১। আকর কবা বচ, খোলাসমেত মসুরি কড়াই ও পোস্তঢেঁড়ী সমপরিমাণে জলে সিদ্ধ করিয়া বারংবার কুল্লী করিলে দন্ত রোগের উপশম হয়।

প্রতিষেধক :—আমরুল শাক ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দাঁত মাজিলে, অথবা সরিষা তৈল ও লবণ মিশাইয়া দাঁত মাজিলে, অথবা রান্নাঘরের ঝুল লবণ সহ একত্র মিশ্রিত করিয়া দন্ত মাজিলে, অথবা এঁটেল মাটি জলে গুলিয়া কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া শুষ্ক করতঃ ঐ গুঁড়ার দ্বারা দন্ত মাজিলে, অথবা আকন্দ আঠা দন্ত বেদনায় দিলে অথবা পাথুরিয়া কয়লা পোড়া ছাইয়ের সহিত শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা মিশ্রিত করিয়া দন্ত মাজিলে রক্তপড়া, মাড়ীফোলা, অকালে দাঁতপড়া ও দাঁতনড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ নিবারণ হয়। প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পর প্রত্যেকবার আহারান্তে এবং শয়নের পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে দন্তধাবন ও কুল্লী করিলে দন্তমাড়ী সবল থাকিবে ও অসংখ্য রোগে বীজাণু নষ্ট হইয়া যাইবে।

নিদানপরিশিষ্টং।

[স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রক্তপিত্তং।

কোরদূষবোদ্দাল প্রায়মন্নং নিষেবিণঃ।
কুলত্থমাষনিষ্পাবসূপোপহিতমেব বা।
দধিমণ্ডোদশ্বিদম্লকাঞ্জিকোপহিতন্তু বা।
মাহিষাবিকবারাহগব্যমৎস্যামিষৈস্তথা।
শুষ্কশাকপিণ্যাকপিলুকো*পহিতং যদা।
‡ মূলকাদিফণিজ্ঝাম্লৈরুপদংশৈঃ সমন্বিতং।
‡ সৌবীরাৎ বদরাম্লান্তমন্নপানং যদাথবা।
পিষ্টান্নমুষ্ণোত্তপ্তো বা ভৃশং বা পয়সাথবা।
রোহিণীশাকমথবা সিদ্ধং সার্ষপতৈলতঃ।
কপোতানাঞ্চ কাণানাং পললস্তু নিরন্তরং।
সেবতে যঃ কুলত্থাদি§পক্কৈর্ব্বা শৌক্তিকৈঃ সহ।
ক্ষীরমাত্রং পিবত্যুষ্ণোত্তপ্তঃ পিত্তং হি তস্য চ।
কোপমাপদ্যতে রক্তং প্রমাণঞ্চাতি বর্ত্ততে।
তেন রক্তেন সংসর্গাৎ তস্য রক্তস্য দূষণাৎ।
তদ্বচ্চ গন্ধবর্ণাভ্যাং রক্তপিত্তমিহোচ্যতে॥
শুক্তাম্লরস উদ্গারো নচাম্লমভিকাঙ্ক্ষতি।
বীভৎসতা চ্ছর্দ্দিতস্য বিদাহঃ স্বেদ এবচ।
প্রস্বেদমূত্রশকৃতাং শরীরাবয়বস্য চ।
হরিল্লোহিতপীতত্বং স্বপ্নে চ দর্শনং ভবেৎ।

---

* পীলুফলং পিলুকস্থানে পিণ্ডালুকং কেচিং পঠন্তি।
† চরকোক্তৈঃ।
‡ সৌবীরমারভ্য বদরাম্লপর্য্যন্তং চরোক্তং।
§ আদিশব্দেন পিণ্যাকশাকজাম্ববলকুচানাং গ্রহণং।

নীললোহিতপীতানাং হরিতানাং তথৈবচ।
অচ্ছিন্নতান্তু রূপাণাং রক্তপিত্তে ভবিষ্যতি॥

যক্ষ্মরোগঃ।

রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ।
তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি কেচিদাহুর্মনীষিণঃ॥
সাহসৈরতিমাত্রৈশ্চ ক্ষতোরুরসি বিক্ষতে।
বায়ুঃ প্রকুপিতো দোষাবুদীর্য্যোভৌ বিধাবতি।
স শিরঃস্থঃ শিরঃশূলং করোতি গলমাশ্রিতঃ।
কণ্ঠোর্দ্ধ্বংসঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদমরোচকং।
পার্শ্বশূলঞ্চ পার্শ্বস্থো বর্চ্চোভেদং গুদে স্থিতঃ।
জৃম্ভাং জ্বরঞ্চ সন্ধিস্থ উরঃস্থশ্চোরসো রুজং।
ক্ষণনাদুরসঃ কাসাৎ কফং ষ্ঠীবেৎ সশোণিতং।
জর্জ্জরেণোরসা কুচ্ছ্রমুরঃশূলাতিপীড়িতং।
ইতি সাহসিকং যক্ষ্ম রূপৈরেতৈঃ প্রপদ্যতে।
একাদশভিরাত্মজ্ঞ সেবেতাতো ন সাহসং॥
হ্রীমত্ত্বাদ্বা ঘৃণিত্বাদ্বা ভয়াদ্বা বেগধারণাৎ।
বাতমূত্রপুরীষাণাং নিগৃহ্ণাতি যদা নরঃ।
তদাবেগপ্রতীঘাতাৎ কফপিত্তে সমীরয়ন্।
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধশ্চৈব বিকারান্ কুরুতেঽনিলঃ।
হর্ষোৎকণ্ঠাভয়ত্রাসশোকরোগাতিকর্ষণাৎ।
অতিব্যবায়ানশনাচ্ছুক্রমোজশ্চ হীয়তে।
ততঃ স্নেহক্ষয়াদ্বায়ুর্বৃদ্ধো দোষাবুদীরয়ন্।
বিকারান্ কুরুতে সর্ব্বান্ পূর্ব্বোক্তানেব* নিশ্চিতং
বিবিধান্যন্নপানানি বৈষম্যেণ সমশ্নতাং।
রুদ্ধা স্রোতাংসি ধাতূনাং বৈষম্যাদ্বিষমং গতাঃ।
দোষা রোগায় কল্পন্তে পুষ্যন্তি ন চ ধাতবঃ॥
পূর্ব্বরূপং ভবেত্তস্য দৌর্ব্বল্যং দোষদর্শনং।

* চরকোক্তপ্রতিশ্যায়কাসস্বরভেদাদীন্।

অদোষেষ্বপি ভাবেষু কায়ে বীভৎসদর্শনং।
ঘৃণিত্বমশ্নতশ্চাপি বলমাংসপরিক্ষয়ঃ।
প্রিয়তা মদিরায়াঞ্চ প্রিয়তাচাবগুণ্ঠনে।
মক্ষিকাঘুণকেশানাং তৃণানাং পতনানি চ।
প্রায়োহন্নপানে কেশানাং নখানাঞ্চাভিবর্দ্ধনং।
পতত্রিভিঃ পতঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈশ্চাভিধর্ষণং
স্বপ্নে কেশাস্থিরাশীনাং ভস্মনশ্চাধিরোহণং।
ক্ষমাভৃতাং জ্যোতিষাম্বাপি পততাং যচ্চ দর্শনং॥
পরং দিনসহস্রাণি যদি জীবতি মানবঃ।
সুভিষগ্ভিরুপক্রান্তস্তরুণঃ শোষপীড়িতঃ॥

কাসঃ।

রুক্ষশাতকষায়াল্পপ্রমিতানশনং স্ত্রিয়ঃ।
বেগধারণমায়াসো বাতকাসপ্রবর্ত্তকাঃ॥
কটুকোষ্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাণামতিসেবনং।
পিত্তকাসকরঃ ক্রোধঃ সন্তাপশ্চাগ্নিসূর্য্যতঃ॥
গুর্ব্বভিষ্যন্দিমধুরস্নিগ্ধস্বপ্নবিচেষ্টিতৈঃ।
বৃদ্ধঃ শেষ্মানিলং রুদ্ধা কফকাসমুদীরয়েৎ॥

হিক্কাশ্বাসৌ।

মর্ম্মাভিঘাতাদ্দৌর্ব্বল্যাদানাহাচ্ছুদ্ধিদোষতঃ।
অতীসারজ্বরচ্ছর্দ্দিপ্রতিশ্যায়ক্ষতক্ষয়াৎ।
রক্তপিত্তাদুদাবর্ত্তাদ্বিশূচ্যলসকাদপি।
পাণ্ডুরোগাদ্বিষাদামাদ্রোগাবেতৌ প্ররোহতঃ।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ
জলজানূপপিশিতপিষ্টান্নক্ষীরসেবনাৎ।]
কঠোরসোঃ প্রতীঘাতাদ্বিবিধৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ।
মারুতঃ প্রাণবাহীনি স্রোতংস্যাবিশ্য কুপ্যতি।
উরস্তঃ কফমুদ্ধূয়ঃ হিক্কাশ্বাসান্ করোতি হি॥

মূর্চ্ছা প্রলাপো বমথুস্তৃষ্ণা বৈচিত্তজৃম্ভণং।
বিপ্লুতাক্ষত্বাস্যশোষৌ যমলায়াং ভবন্তি চ ॥

অরোচকঃ।

প্রক্ষিপ্তস্তু মুখে চান্নং জন্তোর্ণ স্বদতে মুহুঃ।
অরোচকঃ স বিজ্ঞেয়ো ভক্তদ্বেষমতঃ শৃণু।
চিন্তয়িত্বা তু মনসা দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ ভোজনং।
দ্বেষমায়াতি যো জন্তুর্ভক্তদ্বেষঃ স উচ্যতে ॥
যস্য নান্নে ভবেৎ শ্রদ্ধা সোহভক্তচ্ছন্দ উচ্যতে।
কুপিতস্য ভয়ার্ত্তস্য যচ্চ ভক্তনিরোধনং ॥

বমিঃ।

ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধশোকরোগ-
ভয়োপবাসাদ্ধতিকর্ষিতস্য।
বায়ুর্ম্মহাস্রোতসি সংপ্রবৃদ্ধ
উৎক্লিশ্য দোষান্ তত ঊর্দ্ধমস্যন্।
আমাশয়োদ্বেগকৃতশ্চ মর্ম্ম
প্রপীড়য়ন্ ছর্দ্দিমুদীরয়েত্তু ॥
অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈ-
রামাশয়ে পিত্তমুদীর্ণবেগং।
রসায়নীভির্ব্বিসৃতং প্রপীড্য
মর্ম্মোর্দ্ধমাগম্য বমিং করোতি ॥
স্নিগ্ধাতিগুর্ব্বাম্লবিদাহিভোজ্যৈঃ
স্বপ্নাদিভিশ্চৈব কফোঽতিবৃদ্ধঃ।
উরঃশিরোমর্ম্ম রসায়নীশ্চ
সর্ব্বাঃ সমাবৃত্য বমিং করোতি ॥
সমশ্নতঃ সর্ব্বরসান্ প্রসক্ত-
মামপ্রদোষর্ত্তু বিপর্য্যয়ৈশ্চ।
সর্ব্বে প্রকোপং যুগপৎ প্রপন্না-
শ্ছর্দ্দিং ত্রিদোষাং জনয়ন্তি দোষাঃ ॥

(ক্রমশঃ)

কদলীর উপকারিতা।

আমার এক প্রিয় বন্ধু কলার উপকারিতা সম্বন্ধে, আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এবং প্রবন্ধ লিখিবার জন্যও অনুরোধ করেছেন সেইজন্য নিম্নে উহার বিষয় কিছু লিখিলাম, আশাকরি জনসাধারণে ইহা হইতে কিছু উপকারিতা অনুভব করিবেন।

জগদীশ্বর দরিদ্রের আহারের জন্য সোনা রূপার থালা কলাগাছেন, রাখিয়াছে, বলা বাহুল্য যে, উহা তাহার পাতা অধিকন্তু হিন্দু শাস্ত্র মতে উহা ধাতব পাত্র অপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, হবিষ্যান্ন ভোজন বা যাগযজ্ঞ পূজাদির উপাদান সংস্থাপন, কলার পাতেই হইয়া থাকে ও মাঙ্গলিক উপাদান স্বরূপ গৃহস্থের বাড়ীতে আনীত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পূজার নৈবেদ্যে পাকা কলা দেওয়া অপরিহার্য্য; এ ফল দেবতার স্পৃহনীয়।

যে মস্তিষ্ক ও মেধার বলে ভারতের আর্য্য মনীষিগণ অপূর্ব্ব তথ্য সমুদায় আবিষ্কার বা অমূল্য শাস্ত্র নিচয় বিরচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভূয়িষ্ট রূপে কাঁচাকলার দ্বারাই পুষ্ট হইয়াছিল। শাস্ত্রসেবী সাত্ত্বিক পণ্ডিতকুলের কাঁচাকলা যে আহার্য্যের প্রধান উপাদান, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়বৈরাগ্য, শাস্ত্রসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় সংযমাদি যাহা কিছু মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য বা কাম্যবস্তু, কাঁচাকলা, ঘৃত, সৈন্ধব ও আতপান্ন এই চারিটীই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইবার সাধনীভূত।

পৌষ সংক্রান্তির দিনে গৃহস্থ মহিলারা স্বামী পুত্রের হিতকামনায় কলাখোলার নৌকা জলে ভাসাইয়া থাকেন।

কলার গাছ অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, যে হেতু ইহা বাড়ীর ধারে জন্মে, বাগানেও জন্মে, জমি বেশ পাইট করিয়া চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ৭।৮ হাত অন্তর ১॥০ দেড়হাত গর্ত্ত করিয়া এক একটী কলাগাছ রোপণ করিবে, পরে তাহার গোড় হইতে তেউড় বাহির হইবে, ইহার আরও কিছু পাট দরকার করে, কেবল মধ্যে মধ্যে গোড়া কোপাইয়া জঙ্গল নষ্ট করা, আর যে কলাগাছে কলা ফলিবে, তাহা কাটিয়া লইবার পরেই উহার গোড়া সমেত গাছটি উঠাইয়া ফেলিবে এবং তথাকার স্থান অর্থাৎ সেই গাছ উঠানতেযে গর্ত্ত হইবে—তথায় নূতন মাটি দিয়া উহা পুরণ করিয়া দিবে। ঐ প্রকার না করিলে গাছ ক্রমে সরু হয় এবং তাহার ফলও সেই রূপ ছোট ও সরু হয়।

ইহা ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, আমেরিকা, 'ফ্লোরিডা, প্রভৃতি দেশে মধ্যম ও তাপযুক্ত স্থান সমূহে, হিমালয় পাহাড়ে শৈলপুঞ্জোপরি, পূর্ব্ববঙ্গে, মালবার উপকূলে', চট্টগ্রামে, সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, ভারতবর্ষের দ্বীপপুঞ্জে, চীনদেশে, স্পেনদেশের দক্ষিণাংশে, আফ্রিকা, রেঙ্গুন, যবদ্বীপ, ফিলিপাইন, বেসিনদেশে, মান্দ্রাজে, জন্মিয়া থাকে। বিলাতে কিন্তু ভাল কলা জন্মেনা। বোম্বায়ে পতিব্রতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুঃপ্রদ বলিয়া পূজা

করিয়া থাকেন ও স্নানের পর কলাগাছে জল দিয়া থাকেন।

কলার গাছ হস্তীর অতি প্রিয় খাদ্য। তাই ইহার সংস্কৃত নাম "বারণ বল্লভা;" চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত পাতা বলিয়া ইহার নাম "ত্বক্‌পত্রী;" সূর্য্যের আলোক ভিন্ন আদৌ জন্মিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম "অংশুমৎ ফলা।" ফল দেখিতে অনেকটা হস্তী দন্তের মত বলিয়া ইহাকে "হস্তী বিষাণী" বলা হয়। একবার মাত্র ফল হইয়াই গাছ মরিয়া যায় বলিয়া ইহার অন্য নাম "সকৃৎফলা"! গাছের সার নাই, তজ্জন্য নাম "নিঃসারা"। রাজগণের অতি প্রিয় বলিয়া নাম "রাজেষ্টা" বালকেরা ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া "বালকপ্রিয়া"। মানুষের পা স্থির ও সোজা হইয়া থাকলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপ বলিয়া নাম "উরুস্তম্ভা" ইহার অভিধান। অন্যান্য বৃক্ষ সমূহের মধ্যে কদলী শ্রেণী থাকিলে বড়ই শোভা হয় বলিয়া ইহার আর একটি নাম "বনলক্ষ্মী", পত্র বড় বড় হয় বলিয়া "আয়তচ্ছদা", ইহার অঙ্গ মধ্যে তন্তু সমূহ থাকে, এজন্য "তন্তুবিগ্রহা" বলিয়া অভিহিত হয় এবং গাছের ভিতর কেবল জলই সর্ব্বস্ব বলিয়া নাম "অম্বুসারা" ইহার পর্য্যায়। ভারতবর্ষই কলার প্রধান জন্মস্থান, তবে পার্ব্বত্য স্থানে ভাল জন্মে না। হিমালয় পাহাড়ের শৈলপুঞ্জোপরি এক প্রকার ছোট ছোট কলা হয়, তাহাতে বীজই অধিক, শাঁস খুব কম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাই পক্ষীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ খাইয়া জীবন রক্ষা করে।

প্রাণি জগতে যেমন গরু, উদ্ভিজ্জগতে তেমনি কলাগাছ—উভয়েরই মৃদু প্রকৃতি, মনুষ্যের চিরসেবক। গরুর যেমন সব জিনিসই মনুষ্যের ব্যবহারে বা উপকারে আসে, কলা গাছও তেমনি! কলার থোড়, মোচা, এঁটে, পাতা, খোলা, ডাঁটা, ফল, ফুল, ভিতরকার জল এমন কি ঘা, ফোড়া, ফোস্কা প্রভৃতি বাঁধিতে হইলে কলার মাজ (কচি পাতা) আবশ্যক হয়, ইহার ফেলিবার কিছুই নাই।

১৮৫১ সালে ডাক্তার "হাণ্টার" মান্দ্রাজ মহাপ্রদর্শনীতে কলার পাতে যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা ঠিক এক প্রকার পার্চমেণ্টের তুল্য, আর এক প্রকার ঠিক যেন রূপার পাতের মত।

১৮৬৪ সালে ডাক্তার 'রে' ইহার দ্বারা এক প্রকার চিটির কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মহাপ্রদর্শনীতে ঢাকার শিল্পী কলার গাছের সূতায় প্রস্তুত এক প্রকার অপূর্ব্ব রুমাল দর্শকদিগের দর্শনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

কলার খোলা ও ডাঁটা হইতে সূতা প্রস্তুত হয়, তাহাতে দড়ী, কাছী ও সুন্দর কাপড় হয়। প্রবাদ আছে—ঢাকায় কলার সূতার এক প্রকার বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুন্দর কাপড় তৈয়ার হয়।

কদলী পর্য্যায়।

কদলী সুফলা রম্ভা মোচা বারণবল্লভা।
সুকুমারা চর্ম্মন্বতী ত্বক্‌পত্রী নগরৌষধি॥

সংস্কৃত নাম—কদলী, সুফলা, রম্ভা, মোচা, বারণবল্লভা, সুকুমারা, চর্ম্মন্বতী, ত্বক্‌পত্রী, নগরৌষধি।

ইহার অন্যনাম অংশুমৎফলা, কাষ্ঠীলা, বদল, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তীবিষানী, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বাল প্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষী, মোচক, রোচক, আম্রতচ্ছদা, তন্তুবিগ্রহা, অম্বুসারা।

দেশভেদে নামভেদঃ—হিন্দীতে কেলা, কেরা, সবেজ ও কেলাপেড়, বাঙ্গালায় কলা। তৈলঙ্গে—চক্রকেলী, অরটিচেট্টু, বুরগাচেট্টু, দোংড়ভোগে, আরটীকায়া। মহারাষ্টে কেল, গুজরাটে কেল্য। কর্ণাটে মরাবালেকাঠ। তামিলে পাজ মব্রণাপিপলী। ব্রহ্মদেশে হগাপী, লুসাই ভাষায় বাহলা, পালিভাষায় তল ও তমলমপজ, ফারসীতে মাবজমোঝ, আরবীতে তলা, ইংরাজীতে প্ল্যানটেন, ডাক্তারী নাম মুসাসেপিএন্টম্।

কদলীর ভেদ।

মাণিক্য মর্ত্তাংমৃত চম্পকাদ্য ভেদাঃ
কদল্যা বহবোহপি সন্তি।
উক্তাগুণা—স্তেষধিকা ভবন্তি
নির্দ্দোষতা স্যাৎ লঘুতা চ তেষাম্॥

প্রকার ভেদ ও গুণ—মাণিক্য, মর্ত্ত্যমান, অমৃত ও চম্পকাদি জাতি ভেদে কদলী অনেক প্রকার। সেই সকল কদলীতে উক্ত গুণ সকল বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান এবং তাহারা অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও লঘুপাক।

দেশ বিদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ প্রকার কলা আছে তাহার বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করা কঠিন; তবে মোটা মুটি যতগুলি প্রধানতঃ জানা যায়, তাহার নাম নিম্নে বর্ণনা করা হইল :—

২। মর্ত্ত্যমান—সুশ্রী, পীতাভ, সুগোল, গায়ে ফোটা ফোটা হয়, অতীব সুস্বাদু, বাঙ্গালীরা এই কলাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, ইহা দুগ্ধসহ বড়ই উপাদেয় হয়। ইহাকে চাটিম কলাও বলে। মাটাবান হইতে প্রথম ইহা ভারতবর্ষেআসে, সেই কারণ ইহা মর্ত্ত্যমান নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। অমৃত—অতীব মিষ্ট (বোম্বায়ে উৎপন্ন হয়)।

৪। চম্পক কদলী—ঘোর পীতবর্ণ, খুব পাকিলে ঈষৎ অম্ল, দেখিতে ছোট, বেশ সুগন্ধি। বাঙ্গালায় চাঁপা কলা কহে। ইহা মধুর রস, মধুর বিপাক, অতিশীতল, গুরু পাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফজনক ও বাতপিত্ত নাশক।

৫। ঢাকাই মর্ত্ত্যমান—দেখিতে প্রায় সবুজ, তত সুশ্রী নয়, কিন্তু খাইতে ভাল।

৬। কালিবৌ বা কাবুলীকলা—পশ্চিম বঙ্গদেশে কাবুল দেশজাত কলা আর মালব দেশীয় কলার পত্তন হইয়াছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নাম মোহন বাঁশী, রামকলা, কাব্লেকলা, চিনিটোপা, সোমদানা, হাল্ক-শোকো ইত্যাদি। ফল অত্যন্ত ছোট ও মোটা, গাছ খুব মোটা অথচ খর্ব্বাকৃতি, কাঁদি নামিলে মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয়। এই কলা গরম দুধে ফেলিলে গলিয়া যায়, খাইতে মিষ্ট।

৭। শব্রী—ইহাকে স্থান বিশেষে মর্ত্ত্যমান বা কাঁঠালী কলা কহে। এই জতীয় কলার মধ্যে "চাপাকলা" স্থান বিশেষে "কাঠলকুশি" নামেও পরিচিত আছে।

৮। কাঁঠালী—পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ হয়, মর্ত্ত্যমান অপেক্ষা কম স্বাদু, চট্টকাইলে

আঠা আঠা হয়। ইহা পূজাপার্ব্বণে অধিক ব্যবহার হয়। (ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গে কদ্‌মা বলে)।

৯। লতাকাঁঠালী—ইহাও একপ্রকার কাঁঠালী। পূর্ব্বোক্ত কাঁঠালী অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু।

১০। মালভোগ—সুমিষ্ট ও সুতার, মর্ত্তমানেরই প্রকার ভেদ।

১১। ডিঙ্গামাণিক নামে এক প্রকার অতি বৃহদাকার মুখরোচক কলা এই দেশবাসীর নিত্য খাদ্য। ইহার দুই তিনটী কলা খাইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি।　　ক্রমশঃ

রস-সপ্তক।

(শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ)

(১)

হে রসেন্দ্র! শুভ্রকান্ত! কোন পুণ্যবলে—
মহাযোগেশ্বর হ'তে লভিলা জনম?
পার কি বলিতে তাহা, কি তপঃ সাধিলে?
কিম্বা সম্পাদিলা কোন মহত করম?

(২)

পারদ! নতুবা বল হেন শক্তি কা'র
জরাব্যাধি প্রপীড়িত বিশ্বজনগণে
ভবব্যাধি মহার্ণবে অনায়াসে পার—
করিয়া অস্বর্থ নামা হয় ত্রিভুবনে।

(৩)

সূত! তুমি হত হ'লে নাশ জরাময়
মূর্চ্ছিত হ'য়েও কর ব্যাধি বিনাশন।
বদ্ধ ভাবে লহ ওহে যাহার আশ্রয়
অনায়াসে করে সে যে আকাশ গমন॥

(৪)

সূতরাজ! কিন্তু হায়! নাগ বহ্নি আদি
অষ্ট দোষে দুষ্ট কেন স্বভাব তোমার?
বিপরীত হেরি হেন যেন ক্ষীরোদধি
গরল মিশ্রিত প্রায় ভীতির আগার॥

(৫)

সূতক। অথবা তব নিসর্গ নির্ম্মল
কলুষিত হইয়াছে লভি সহবাস—
গিরি আদি সনে, ওগো তুমি যে তরল,
কঠিন যে তারা সবে নাহি পরকাশ ?

(৬)

শিবতেজঃ! হেরি ইহা সিদ্ধি নাগার্জ্জুন
সংসর্গজ তুষ্টি তব বিদায় কারণ,
প্রক্রিয়া করিলা কত অতি সুনিপুণ,
মহৎ মহতে করে স্বস্থানে স্থাপন ॥

(৭)

রস। তুমি, তাই আজি রসের আগার
উপমিত হয়ে আছ শঙ্করের সনে।
যোগের সাধন তুমি ভারত মাঝারে,
স্বগুণ লভিলে পুনঃ মিলি সাধু সনে ॥

বঙ্গে নানা রোগে মৃত্যুর তালিকা।

জেলার নাম	লোক সংখ্যা	কলেরা	বসন্ত	রাজসাহী	১০৫৭০৩৭	৩২২৮	১৩১
				দিনাজপুর	১৬০৭৩২৪	১৮৪	৭২০
বর্দ্ধমান	১৩৪৩১৮৫	১৭৮১	১৪৬	জলপাইগুড়ি	৯২১৭৪৯	৭৯	৩৪৪
বীরভূম	৮৩৮৬৫৫	৫৫৪	১৩৪	দার্জ্জিলিঙ্গ	২৫৪০৪৫	×	×
বাঁকুড়া	৯৬৪৪৮৭	১১০৫	৯	রঙ্গপুর	২৪৮৮৭৭৮	৩০৭৫	৭৪
মেদিনীপুর	২৫৯৫০৭১	৪৪২০	৩৭৪	বগুড়া	১০৩২৩০০	৩৮১	৯৭
হুগলী	৯০০৮০২	৭৭৭	৭৮	পাবনা	১৩৪৪৬৩৩	৪৩০৬	৪৩
হাবড়া	৭৭৮৮৯৩	১৩৩৪	৫৬	মালদহ	৯৫৮৩০	১২৬	২৪৮
২৪ পরগণা	১৯৯৮৩১৮	৭৪০২	২৮৩	ঢাকা	২৯৭৫৯১৫	৭৪৫৭	১২৬৯
নদীয়া	১৩৯০৭০৪	২৫০২	৬৩	ময়মনসিংহ	৪৭১০৬৬৯	১৭৫৯২	১১৮৮
মুর্শিদাবাদ	১১৮২৯৮৩	৮৭০	৭৪১	ফরিদপুর	২২১০০৫৮	২৭৫৯	৩৬১
যশোহর	১৭০০৯২৭	২৬১৩	৪১০	বাখরগঞ্জ	২৫৬৩৮৪৯	৩৮২০	১২১
খুলনা	১৪২১১১৬	১১৪৪	৩৪	চট্টগ্রাম	১৫৭০৭৬০	১৪৮	১৯৪

নোয়াখালী	৩৩৬৫০৪১	১০০৭	৮৬
ত্রিপুরা	২৬৭৮৬২৭	২০৩৯	৫৭৪
সমগ্রবঙ্গ	৪৩৪৪১৭৮৭	৭৩,৯৪৩	৭৮০৫
ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্রাজ্য	৪৭২৬৩৫৩০	×	৩

জেলার নাম	জ্বর	ফুস্‌ফুসের রোগে	উদরাময় ও আমাশয়ে
বর্দ্ধমান	৪০৩৫২	১১ ৩	৯৯৯
বীরভূম	২৭২০৮	৫৯৬	৮২
বাঁকুড়া	২৭৫০৭	১৩৭০	৯৬৩
মেদিনীপুর	৫৯২৭০	২০০৮	১৫০৬
হুগলী	২৩৪২৪	৯০৮	১৩৭৭
হাবড়া	১২০৫৫	৭৪২	২৯২২
২৪ পরগণা	৪৩৯০৬	৫২১	৫৬১
নদীয়া	৪৯৬৩৭	১২২৬	৭৬
মুর্শিদাবাদ	৩৮২১১	১২১	১৬০
যশোহর	৫৪৫৫১	৫৪১	১৯৭
খুলনা	২৭০১১	৯৪	১৫৬
রাজসাহী	৫৩৫৬৮	১০৭	১১৬
দিনাজপুর	৫৬৮৬৮	২৬৭	৭৪
জলপাইগুড়ি	২১৮৭১	৭১৪	৮৭৮
দার্জ্জিলিঙ্গ	৮২০৩	৭২৯	৫২৬
রঙ্গপুর	৬১৬৯৭	১৭৩	১৪১
বগুড়া	২৭৫৯৩	৬৩১	২০২
পাবনা	৩৫২৮০	২০	৬০
মালদহ	২৪০২৯	১৫৫	১২
ঢাকা	৬১৫২৩	২৪৬	১৮৯৮
ময়মনসিংহ	৫৭৬৯৪	৯৪৯	১১০৬
ফরিদপুর	৫৭৬৯৪	৯১	৪২২
বাখরঞ্জ	৪৭৯৩৯	৯২৭	১৩৭
চট্টগ্রাম	৩৪৯১৭	১৭০	২২৯
নোয়াখালি	২৮০৫৪	৩৫	২৩৪
ত্রিপুরা	৩৫১০৬	১০২	৭৭২
সমগ্রবঙ্গ	১০৪৬৬৮১	১৪৫৬৬	১৬৬৮৯
ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্রাজ্য	২২১৭	৪২৫৪৫	২৫৪

জেলার নাম	মোট মৃত্যু	সহস্র লোকের মধ্যে জ্বরে মৃত্যুর হার
বর্দ্ধমান	৫০২৭৬	৩০০০
বীরভূম	৩২৫০১	৩২'৭
বাঁকুড়া	৩৭৬৯৯	২৮'৫
মেদিনীপুর	৮০৩১১	২২'৮
হুগলী	৩১ ৮৫	২৬'০
হাবড়া	২.৩৭১	১৫'৫
২৪ পরগণা	৫৯৮২৩	২২'০
নদীয়া	৬১১৮	৩৫'৭
মুর্শিদাবাদ	৪৭৪২১	৩২'১
যশোহর	৬৩৯৬	৩২'১
খুলনা	৩৬৯৮	১৯'০
রাজসাহী	৬২৫৯৪	৩৬'৮
দিনাজপুর	৬১০৮৮	৩৩'৭
জলপাইগুড়ি	২৮৫৬১	২৭'০
দার্জ্জিলিং	১১২৪৬	৩২'৩
রঙ্গপুর	৬৭২২২	২৪'৮
বগুড়া	৩৩৭৬৪	২৬'৭
পাবনা	৪১৫৭৮	২৬'২
মালদহ	২৭৯৩৫	২৫'১
ঢাকা	৮৪৪৯৫	২০'৭
ময়মনসিংহ	১২৩৭৫১	১৮'৩
ফরিদপুর	৬৭৯৬৫	২৬'১
বাখরগঞ্জ	৭১৮৯৩	১৮'৭
চট্টগ্রাম	৩৭৯০২	২২'৩
নোয়াখালী	৩৪৯৬৩	১৯.২
ত্রিপুরা	৪৬৬০০	১৩'১
সমগ্রবঙ্গ	১৩২৩২৬৬	২৪১
ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্রাজ্য	৪৫৮৬২০৯	২৯'১

—সঞ্জীবনী।

পিত্ত।

(কবিরাজ শ্রীশরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

মহামতি বাগ্‌ভটের টীকাকার শারীর স্থানে তৃতীয় অধ্যায়ে পাকক্রিয়া প্রসঙ্গে ব'লিয়াছেন যে

"নম্ন পার্থিবাদ্যুষ্মভিঃ পক্কস্য পুন র্ধাতূষ্মভিঃ পাকঃ। ধাতূনামপি পাঞ্চভৌতিকত্বার্শ তত্রাপি পার্থিবাদ্যুষ্ম ভাবঃ। তৈশ্চ পার্থিবাদ্যুষ্মভিঃ পুনঃ পাকইত্যেবমষ্টাদশ প্রাপ্নুবন্তি।" ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—"সত্যমেবৈতৎ, কিন্তু ত এব পঞ্চোষ্মাস্মানঃ পার্থিবাদয়ঃ স্থানান্তর প্রাপ্তা ধাতূষ্মাণ ইতি ব্যাপদেশমাসাদন্তি।" ইহার ভাবার্থ এই—পার্থিবাদি পঞ্চভূতগত যে পঞ্চ উষ্মা সেই ধাত্বাদি স্থান গত হইয়া ধাতূষ্মা বলিয়া কথিত হয়। এবং ইহার একটী সুন্দর উপমাও দেখাইয়াছেন—যথা "যথোদকং স্থানান্তরগতং লসীকাদি ব্যপদেশং লভতে।" অর্থাৎ যেমন এক শরীরস্থ জল স্থানান্তরে গমন করিয়া লসীকাদি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। অরুণ দত্তের এই কথায় বুঝিলাম যে ভূতোষ্মা ও ধাতূষ্মা একই পদার্থ; কেবল স্থান ভেদে সংজ্ঞা ভেদ, আবার পাচকাগ্নি হইতে ভূতাগ্নি ও যে অভিন্ন তাহাও নিঃসন্দেহ, কারণ আমরা পূর্ব্বে সুশ্রুত বাক্য দেখাইয়াছি যে—"তত্রস্থমেব চাত্মশক্ত্যা শেষানামেব পিত্তস্থানানাং শরীরস্য চাগ্নি কর্ম্মণা অনুগ্রহং করোতি।" এই বাক্য দ্বারা বুঝিয়াছি যে এই পাচক পিত্তই সমস্ত তাপের বা অগ্নির মূলীভূত কারণ, ইহার বৃদ্ধিতেই সমস্ত অগ্নির বৃদ্ধি, এবং ক্ষয়ে সমস্ত তাপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে, সুতরাং তীক্ষ্ণত্বও মৃদুত্ব বিশেষে যে অগ্নির সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম, এখন সদ্‌ভিঃ সমাধি র্বিধেয়ঃ।

আমরা পূর্ব্বে পিত্তকে দুই অবস্থায় বিভক্ত করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়াছি, এবং তেজঃ স্বভাব পিত্ত সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা বিবৃত করিয়াছি। এখন দ্রব স্বভাব পিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শাস্ত্রে কথিত আছে যে রক্তের মল পিত্ত, এই সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—যথা— "কিট্ট মন্নস্য বিন্মূত্রং রসস্তু কফোঽসৃজঃ। পিত্তং মাংসস্য খমলা মলঃ স্বেদস্ত মেদসঃ॥" এই মলভূত পিত্তই পিত্তকোষে সঞ্চিত হয়, এবং বমনাদিতে বহির্গত হইয়া থাকে।

"পিত্তেবিরেচনং" এই বাক্যও এই পিত্তের বিষয়ীভূত। উষ্মাত্মক পিত্ত ও এই পিত্তকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং দ্রবপিত্ত দূষিত হইলে তেজঃপিত্ত ও দূষিত হয়। আবার দ্রবপিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে তৈসজ পিত্ত ও স্বভাবে অবস্থান করে। দ্রব পিত্ত যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন দ্রবাংশের বৃদ্ধিহেকতু

তৈজস পিত্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সুতরাং পরিপাক যথানিয়মে নিষ্পন্ন না হওয়ায় অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, এই দ্রবপিত্ত রক্তের সমগুণ বিশিষ্ট, কারণ, আমাদের শাস্ত্রে আছে "কারণ গুণাঃ কার্য্যগুণ মারভন্তে", অর্থাৎ কারণানুরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে পিত্তের কারণ রক্ত, সুতরাং রক্ত আর দ্রব স্বভাব পিত্ত যে অনুরূপ গুণবিশিষ্ট তাহা বলিতেই হইবে, এই জন্যই "রক্তপিত্ত" রোগে ভাগ্‌ভট রক্ত পিত্তের তুল্যতা নিরূপণ করিয়াছেন তাহার বচন এই—

"পিত্তং রক্তস্য বিকৃতেঃ সংসর্গাদ্ দূষণাদপি।
গন্ধবর্ণান্নু বৃত্তেশ্চ রক্তেন ব্যপদিশ্যতে॥"

রক্ত ও পিত্তের কার্য্য কারণতাবশতঃ তুল্যগুণ নিবন্ধন, এক কারণেই বৃদ্ধিক্ষয় হইয়া থাকে, সেই জন্যই রক্তকে রোগের সাক্ষাৎ জনক না বলিয়া দোষ সংজ্ঞক বায়ু পিত্ত কফই সাক্ষাৎ রোগ জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ পিত্ত যে কারণে কুপিত হয় রক্ত ও সেই কারণে কুপিত হয়। পিত্ত যে ঔষধান্ন বিহার দ্বারা প্রশমিত হয়, রক্ত ও সেই ঔষধান্ন বিহার দ্বারা প্রশমিত হয়। সুতরাং রক্তজ রোগ পিত্তজ রোগেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া রক্তকে আর দোষ সংজ্ঞায় অবিহিত করা হয় নাই, এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বহ্নি যেমন কাষ্ঠাদি আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, তৈজসপিত্ত ও তেমনি দ্রব পিত্তকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব দ্রব পিত্ত ও তৈজস পিত্ত পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাবে অবস্থান করে। কিন্তু উভয়গত দ্রবত্ব ও তৈজসত্বাদি বিরুদ্ধ গুণ হইলেও সহজত্ব হেতুক সর্পস্থিত বিষ যেমন সর্পকে হিংসা করেনা; তেমন সহজাত দ্রবত্ব ও তৈজসত্ব পরস্পরকে উপহত করে না দীপ আর বর্ত্তি স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও প্রজ্বলিত বর্ত্তিকেই দীপ বলিয়া ব্যপদেশ করে, তেমনি পিত্ত দ্রব ও তৈজস ভাবে ভিন্ন হইলেও উক্ত দ্রব তেজঃ সমুদয়কেই পিত্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং উহাদের গুণ ও চরকাদি মহর্ষিগণ একত্রেই নিবেশ করিয়াছে; যথা "সস্নেহ মুষ্ণং দ্রবমম্লং সরং কটু" ইত্যাদি, ইহার ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে।

পিত্তের উৎপত্তি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি দ্রব স্বভাব পিত্ত রক্তের মল ভাগ। তাহার উৎপত্তি শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, রসের সূক্ষ্মাংশ যকৃৎ প্লীহাস্থিত রঞ্জকাখ্য পিত্তদ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে অভিহিত হয়, সেই রক্ত পুনঃ স্বধাতুষ্মাদ্বারা পরিপক্ক হইয়া দধি ঘৃত ন্যায়ানুসারে মলভাগ ত্যাগ করে, সেই মলভাগকেই দ্রবপিত্ত বলে। তৈজসপিত্তের উৎপত্তি, যথা আমাশয়স্থিত ভুক্ত দ্রব্য হইতে রস উৎপন্ন হইলে রসোৎসৃষ্ট ভুক্ত দ্রব্য পুনঃ পাচকাগ্নি দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া বিদগ্ধ হইয়া থাকে, এই বিদাহের কারণ বোধ হয় অগ্নির সামীপ্য হেতুক তাপাধিক্য। সেই বিদগ্ধ ভুক্ত দ্রব্য অম্লতা প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে এক প্রকার পিত্ত উদ্‌ভূত হয়; সেই পিত্তই তৈজস পিত্ত বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত। পিত্তাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে চরকের মত, যথা—"অন্নস্য ভুক্ত মাত্রস্য ষড়্‌রসস্য প্রপাকতঃ। মধুরাখ্যাতাৎ ককোভাবাৎ কেনভাব উদীর্য্যতে॥ পরন্তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধ

স্যান্নভাবতঃ। আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্ত মচ্ছ মুদীর্য্যতে॥" চরকের এই "অচ্ছপিত্ত" শব্দে রক্তের মল পিত্তই ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং "অচ্ছপিত্ত" শব্দে তৈজসপিত্তই লক্ষিত হয়, কারণ এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোন পিত্তের স্থিতি নাই। এবং পিত্তের অচ্ছত্ব বিশেষণ ও অনর্থক হইয়া পড়ে।

চরকের এই বাক্য দ্বারা পিত্তের উৎপত্তি স্বীকার করিলে পিত্তের অনিত্যত্ব আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কারণ; "ধ্বংসপ্রাগভার রহিত্বং নিত্যত্বং" এই বৈশেষিক নিত্য লক্ষণ অব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, উৎপন্ন বস্তুর প্রাগভাব থাকেই। তথা নিত্য পঞ্চ মহাভূতান্তর্গত তেজকে পিত্ত বলা অসঙ্গত হয়। এই বিপক্ষ বাদীর বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, চরক কথিত উৎপন্ন পিত্ত সেই পঞ্চভূতান্তর্গত তৈজস পিত্তেরই শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র।

অর্থাৎ রসোৎসৃষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের বিদাহ হেতু অম্লতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা হইতে এক প্রকার তৈজস শক্তির উদ্ভব হয়। সেই শক্তি-দ্বারা আমাদের তৈজসপিত্তের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং সেই বর্দ্ধিত শক্তি তৈজস পিত্ত, গ্রহণী নাড়ীতে অবস্থান করিয়া স্বকীয় সূক্ষ্মাংশ দ্বারা অন্যান্য আলোচকাদি পিত্তের স্বকার্য্য শক্তি বর্দ্ধন করে। এতদ্দ্বারা বুঝিলাম যে, দ্রবস্বভাব পিত্ত রক্তের মল এবং তৈজস পিত্ত পাঞ্চভৌতিক তেজঃ পদার্থ। এই তেজ পদার্থ যখন পচনাদি ক্রিয়ায়ানৈরন্তর্য্য বশতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন রসোৎসৃষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের অম্লভাব হইতে এক প্রকার তেজঃশক্তি সমুদ্ভূত হইয়া দুর্ব্বল তৈজস শক্তিকে উদীপিত করিয়া স্বকর্ম্ম সাধনে সামর্থ্য দান করে।

পিত্তের স্থান।

পিত্তের স্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"স্বেদোরসোলসীকারুধিরমাশায়শ্চ পিত্ত-স্থানানি। তত্রামাশয়ো বিশেষণ পিত্ত স্থানং।" অর্থাৎ স্বেদ, রস, লসীকা, রক্ত ও আমাশয় পিত্তের স্থান, তন্মধ্যে আমাশয়ই পিত্তের বিশেষ স্থান। আমাশয় শব্দে এস্থলে গ্রহণী নাড়িকেই লক্ষ্য করিয়াছে, কারণ আমাশয় রসের স্থান বলিয়াই সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, স্বেদ শব্দে এ স্থানে স্বেদের কারণ মেদকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার বহুস্থলেই প্রমাণিত হইয়াছে। পিত্ততেজদ্বারা মেদ হইতে স্বেদের নির্গম হয়। তাই বোধ হয়। স্বেদকে পিত্তের স্থান বলা লইয়াছে। রস শব্দে রসের স্থানে লক্ষণা, রসের স্থান হৃদয়, তথাচ ভাবমিশ্র—"সর্ব্বদেহ চরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলং। সমান মরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ॥" সেই হৃদয়স্থিত পিত্তেরই সাধকসংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে পরে প্রতিপাদিত হইবে, লসীকা, ত্বঙ্‌মাংসের অভ্যন্তরস্থিত জল বিশেষকে লসীকা বলে, তথাচ চরক—যত্তু মাংস ত্বগন্তরে উদকং তল্লসীকা সংজ্ঞ-লভতে।" এই লসীকাস্থিত পিত্তকে ভ্রাজক পিত্ত বলে। রুধির শব্দেও তদাধারে লক্ষণা করিতে হইবে। রক্তের আধার প্লীহা ও যকৃৎ। উহারাই রঞ্জক "পিত্তের স্থান, আমাশয় শব্দে তৎ সমীপস্থিত গ্রহণী তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছে। অতএব তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা বাহুল্য। এখন আমাদের দেখিতে

হইবে—গ্রহণীকে পিত্তের বিশেষ স্থান বলা হইল কেন? আমাদের মনে হয়, এই গ্রহণী-স্থিত পিত্তই অন্নকে পরিপাক করে; এবং এই স্থানের পিত্তই অন্যান্য স্থানের পিত্তের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে; সেই জন্যই পিত্তের বিশেষ স্থান গ্রহণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেও বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এস্থানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন পিত্তের প্রাকৃতিক কর্ম্ম বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পিত্তের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

শাস্ত্রকারগণ পিত্তের স্বভাবজাত কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা—

"দর্শনং পক্তিরুষ্মাচ ক্ষুৎ তৃষ্ণা দেহ মার্দ্দবং।
প্রভা প্রমাদো মেধাচ পিত্ত কর্ম্মা বিকারজং॥"

দর্শন ক্রিয়া দৃষ্টি মণ্ডলস্থ আলোচক পিত্তের কার্য্য। অর্থাৎ আমাদের নয়নে পাঁচটী মণ্ডল আছে যথা পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্ম মণ্ডল, শ্বেত মণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল, ও দৃষ্টি মণ্ডল; সমস্ত মণ্ডলের অভ্যন্তরে দৃষ্টিমণ্ডল অবস্থিত, এই দৃষ্টিমণ্ডল পঞ্চমহাভূতের সারাংশ হইতে উৎপন্ন, এবং ইহা খদ্যোত ও ফুলিঙ্গ স্বরূপ ও অব্যয় তেজ বিশিষ্ট। যথাহ সুশ্রুত "মসূরদলমাত্রান্তু পঞ্চভূত প্রসাদজাং, খদ্যোত বিস্ফুলিঙ্গভ্যাং সিদ্ধাং তেজোভিরব্যয়ৈ॥" আমাদের অন্তঃ-করণ মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা তদ্‌বিষয় রূপাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাকেই বলে দর্শনাদি ক্রিয়া অতএব মন, দৃষ্টিমণ্ডলস্থিত যে তেজরূপ আলোচক পিত্ত আছে, তাহার আনুকুল্যেই রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় মনের সেই গ্রহণ ক্রিয়ার সাধকতম বলিয়া ইন্দ্রিয়ের করণত্ব সিদ্ধ থাকিলেও কর্ত্তৃত্বের ও বিবক্ষা বহুশঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় সেই জন্যই দর্শনক্রিয়া তেজময় পিত্তেরই কার্য্য বিবক্ষাকরিয়া গ্রন্থকার ও দর্শনকে পিত্তের কার্য্য তালিকায় ভুক্ত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

চিকিৎসায় রসৌষধ।

(কবিরাজ শ্রীশচান্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

ধরাপৃষ্ঠে প্রথম যখন রোগের আবির্ভাব হইল, মানব তখন তাহার সম্মুখে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাইল, তাহাই লইয়া রোগারোগ্যের জন্য যত্নপর হইল। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি এবং নানাবিধ জীবের মাংসাদি সেই সময় হইতে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই সকল দ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইলেও কয়েকটী কারণে চিকিৎসকগণ ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যদিও উদ্ভিদই জীবের প্রকৃত আহার এবং শারীর বৈষম্য দূর করিতে সর্ব্বথা সমর্থ, তথাপি কাল প্রকর্ষে ভূমির উর্ব্বরতা-

হানি নিবন্ধন উদ্ভিদের শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল এবং যে সকল জীবের মাংসাদি লইয়া কল্পিত হইত, তাহাদের মাংসাদিও হীন শক্তি উদ্ভিজ্জ আহারের ফলে আর সম্যক্ পুষ্ট থাকিলনা। এই সকল কারণে তাহাদের রোগ নাশক শক্তিও হীন হইতে লাগিল বলিয়া ঔষধে আশানুরূপফল পাওয়া গেলনা। তখন রোগ নাশের জন্য ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধির আবশ্যকতা উপলব্ধ হইল এবং "মাত্রায়া হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্ত্তয়েৎ" অর্থাৎ হীন মাত্রায় দ্রব্য প্রয়োগ করিলে বিকার নিবৃত্ত হয় না, এই বিধি নিবদ্ধ হইল। এই সকল কারণে "উত্তমস্য পলং মাত্রা" ইত্যাদি অর্থাৎ বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে ভেষজের মাত্রা একপল নির্দ্ধারিত হইল দেখিতে পাই।

কিন্তু ইহাতেও ভিষক্‌গণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, ভেষজ যে প্রকার শক্তিহীন হইয়াছে, অন্নপানীয়ও ঠিক সেই প্রকার শক্তিহীন হইয়াছে এবং সেই হীনশক্তি অন্নাদির পান ভোজন জন্য মানব শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ দুর্ব্বল শরীরে এতাধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী সহ্য করিতে পারেনা, এই জন্য ভেষজ সেবন করাইয়া কিছু ভোজন করাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়, নতুবা অত্যন্ত গ্লানি এবং বলক্ষয় উপস্থিত হয়। যথা "ভেষজমন্নহীনম্। গ্লানিং পরং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ"।

পরন্তু কাষ্ঠৌষধ সকল, তিক্ত, কটু, কষায় প্রভৃতি অদ্ভুত রস বিশিষ্ট বলিয়া নিরন্তর ব্যবহার করিলে অরুচি প্রভৃতি রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং অরুচি প্রভৃতির ফলে রোগীর আহার কমিয়া যায় বলিয়া রোগী অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু আরোগ্য বলকেই আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় "যদুক্তং বলাধিষ্ঠাণমারোগ্যম্"।

সেই বলই যদি দূর হয়, তবে আরোগ্যের আশা কমিয়া যায়। পরন্তু কাষ্ঠৌষধ অধিকাংশই সংশোধন বলিয়া বহু স্থলেই বমন বিরেচন প্রভৃতির কার্য্য করে। এই জন্য অনেক স্থলে, ইহার প্রয়োগে হিতের পরিবর্ত্তে অহিতই সাধিত হইয়া থাকে। অতিসার, গ্রহণী, যক্ষা প্রভৃতি রোগে কষায় প্রয়োগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়; কারণ জ্বরঘ্ন ঔষধ মাত্রেই অনুলোমক এবং অতিসারঘ্ন ঔষধ মাত্রেই গ্রাহী, উভয়েই বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এই জন্য চিকিৎসককে জ্বরাতিসার চিকিৎসার বিশেষ বেগ পাইতে হয়। শোথে অতিসার কিংম্বা অতিসারে শোথ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অরিষ্টলক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ইহার কারণ এই—শোথের যে সকল ঔষধ নিরূপিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই রেচন; সুতরাং শোথ কমাইতে গেলে অতিসার বাড়ে এবং অতিসার কমাইতে গেলে শোথ বাড়িয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসায় কোনই ফল পাওয়া যায় না।

রোগী রোগের প্রভাবে অভিভূত কিম্বা অচৈতন্য হইয়া পড়িলে অধিক মাত্রায় প্রয়োজ্য ঔষধ সকল সেবন করান যায় না; সুতরাং সেরূপ স্থলে ভেষজাভাবে রোগীর অপকার সাধিত হয় আবার ঘৃতাদি স্নেহ ঔষধ ও সর্ব্বস্থলে প্রয়োগ করা চলেনা, কারণ অনেক স্থলে ঐ সকল ঔষধের প্রভাবে

অজীর্ণ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়।

কাষ্ঠৌষধ প্রয়োগের আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে, ঔষধ সকলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; একপ্রকার শোধন এবং অন্যপ্রকার শমন। যদুক্তং—শোধনং শমনঞ্চেতি সমাসাদৌষধং দ্বিধা। ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ আছে। এই শোধন ঔষধই রেচন, স্রংসন, অনুলোমন, ভেদন, বমন প্রভৃতি নানাপ্রকারের দেখা যায় এবং শোধন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরুহন, লাবণ প্রভৃতি এই পঞ্চকর্ম্মের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম অতি কষ্ট সাধ্য এবং অনেক রোগীই শোধনার্হ নহে। ইহাদের জন্য সংশমন ঔষধ ব্যবস্থেয়, কিন্তু কাষ্ঠৌষধের মধ্যে সংশমন ঔষধ খুব কমই পাওয়া যায়। অপর অসুবিধা এই যে, কাষ্ঠৌষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইলে কালের অপেক্ষা করিতে হয়, যেমন সামজ্বরে জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবে না। অতিসার, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শ প্রভৃতি রোগের সামাবস্থায় স্তম্ভন ঔষধ দিবে না। ইহাতে অনেক সময় যে খারাপ ফল হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল কারণে স্মরণাতীত কাল হইতে চিকিৎসার জন্য নানাবিধ সুগম উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা চলিয়াছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত ভেষজগুলি হীনবীর্য্য হইলেও পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রত্নরাজি রোগনাশের জন্য হীনবীর্য্য নহে। এসকল দ্রব্যে ভেষজ শক্তিপ্রদান পুরঃসর রোগে প্রয়োগ করিতে পারিলে উহারা যে রোগ দূর করিতে সমর্থ হইবে, চিকিৎসকগণ এই সিদ্ধান্ত করিলেন। অথর্ব্ববেদে ধাত্বাদির রোগ নাশক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে নানাপ্রকার ধাতব ঔষধের ব্যবহার বিধি বিদ্যমান আছে। পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ তান্ত্রিক যুগে রসৌষধসমূহের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সর্পবিষের ঔষধ।

রংপুর মিরগঞ্জ হাট হইতে এছহাক উদ্দীন কবিরাজ "বঙ্গবাসীতে" লিখিয়াছেন, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এ দেশে বহু লোক সর্প দংশনে মারা পড়িয়া থাকে। সর্প বিষ নাশের খুব সহজ ও সুলভ ঔষধ অনেক আছে। কিন্তু তাহা কেহ জানেনা, ইহাও সর্প দংশনে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। আমাদের দেশের সকল গাছ গাছড়াই কোন না কোন রোগের ঔষধ। লাল ভেরণ্ডা সর্প বিষ নাশের আসল ঔষধ সর্প দংশনের পরে রোগীকে তিনটি লাল ভেরাণ্ডার কচিপাতা আধতোলা লবণ সহ রগ্‌ড়াইয়া খাইতে দিবে। রোগী উহা চিবাইয়া রস পান করিবামাত্র উপকার পাইবে, তাহার শরীরের সকল বিষ জল হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে কেহ বিশেষ বিবরণ জানিত ইচ্ছা করিলে সংবাদ দাতার নিকট পত্র লিখিতে পারেন।

হরীতকী।

(কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী।

— :০: —

হরিতা বরণে, হরের ভবনে, জনম বলিয়া হরীতকী নাম।
সর্ব্বরোগ নাশে ক্ষমতা প্রকাশে কে আছে এমন সর্ব্বগুণ ধাম॥
জীবন্তী পুতনা, অমৃতা অভয়া, বিজয়া রোহিণী চেতকী সাতটি।
হরীতকী ভেদ, বর্ণে গুণে হয় জানিও কথাটী অতিশয় খাঁটি॥
কণক বরণা, সর্ব্বরোগ হরা, 'জীবন্তী' প্রাণোপযোগিনী হয়,
অতি অল্পত্বক্, মলাদি নিঃসারি' শোধন কারিণী 'পুতনা' নিশ্চয়।
ত্রিদলা 'অমৃতা' অমৃতের মত কোষ্ঠ শুদ্ধি তরে নিয়োগে সকলে।
পঞ্চদল যুতা অভয় দায়িনী অক্ষি রোগ নাশে 'অভয়া' কৌশলে॥
অলাবু আকৃতি বিজয়দায়িনী 'বিজয়' সকল অগদ বিনাশে।
ক্ষত পূরণেতে প্রযুক্তা 'রোহিণী' গোলাকার বলি ভিষকে প্রকাশে॥
ত্রিশিরা 'চেতকী' চৈতন্য দায়িনী চূর্ণে ব্যবহৃতা, সুফল প্রদানে।
নূতন কঠিন গোল স্নিগ্ধ গুরু নিমজ্জিত যাহা সলিলে পতনে॥
পঞ্চরসযুতা জেনো হরিতকী কেবল লবণরস হীনা হয়।
মজ্জায় মধুর অম্ল স্নায়ু মাঝে তিক্ত বৃন্তে ত্বকে কটু রস রয়॥
অস্থিতে কষায়, রুক্ষোষ্ণ মধুর অগ্নি বৃদ্ধি করে হরে দুর্ব্বলতা।
মেহ শ্বাস কাস জ্বর কুষ্ঠ শোথ কৃমি গুল্ম নাশে কোষ্ঠ বিবদ্ধতা॥
বল বীর্য্য আয়ুঃ বর্দ্ধক পরম রসায়ণ রূপা বুদ্ধিদা অতুলা।
দৃষ্টি শক্তিপ্রদা বিনাশে গ্রহণী ছার্দ্দি হিক্কা শূল আনাহ কামলা॥
বিষমজ্বরহা, কণ্ডূ হৃদিরোগ যকৃৎ প্লীহাশ্মরী আধ্মান হারিণী।
হয়না কুপিতা কভু হরীতকী মায়ের মতন পালনকারিণী॥
মধুরান্ন রস হেতু বায়ুনাশে কষায়াদি স্বাদু হেতু পিত্ত হরা।
কটুরসহেতু শ্লেষ্মাবিঘাতিনী, তাই হরীতকী নাশে ব্যাধি জরা॥

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, 'গোবর্দ্ধন প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১২নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | মাঘ ১৩৩০ সাল | ৫ম সংখ্যা।

কফ বা শ্লেষ্মা।

(কবিরাজ শ্রীশরৎ চন্দ্র সেন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

—:-*-:—

কফ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে, আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে, চন্দ্র যেমন স্বকীয় সৌম্যগুণ দ্বারা সূর্য্য সন্তাপ হইতে জগৎকে রক্ষা করে, তেমনি কফও স্বীয় সৌম গুণ দ্বারা পিত্ত সন্তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করিতেছে, শরীরে কফের ক্ষীণতা হইলেই শরীরোষ্মা বা পিত্ততেজ বর্দ্ধিত হইয়া শরীরের ধাত্বাদি শোষণ করিয়া শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, পক্ষান্তরে, কফ প্রবৃদ্ধ হইলে শারীরোষ্মা ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অতএব কফ, পিত্তের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট; অথচ এক দেহেই নিরন্তর তুল্য উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছে, ইহাকেই বলে ভগবানের অচিন্ত্য কৌশল।

এই কফের মূল কারণ পঞ্চভূতান্তর্গত জল; সুতরাং জলেরও যেগুণ, কফেরও সেই গুণ বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বায়ু ও পিত্তের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বায়ু ও পিত্ত স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত, তথা কফ ও স্থূল সূক্ষ্ম দুই ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ পরমাণু রূপ কফ সূক্ষ্ম এবং পরমাণু সমূহরূপ কফ স্থূল। বায়ু পিত্ত কফের এই স্থূল সূক্ষ্মের কারণ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বায়ু পিত্ত ও কফের স্থূলত্ব শরীরের বিশিষ্ট স্থানে ব্যাপক ও সূক্ষ্মত্ব সর্ব্ব দেহ ব্যাপক, অতএব বিশিষ্ট স্থান স্থায়ী বায়ু, পিত্ত কফ বিকৃত হইলে তন্নিষ্ঠ সূক্ষ্মাংশের বিকার জন্মিয়া থাকে, সেই সূক্ষ্মাংশের বিকৃতি নিবন্ধনই শরীরস্থ সমস্ত বায়ু পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া উঠে। তজ্জন্য সর্ব্বদেহেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, নতুবা শরীরের এক দেশে উৎপন্ন অর্শঃ প্রভৃতি রোগের হারিদ্রত্বঙনখাননাদি সর্ব্ব দেহ ব্যাপক লক্ষণ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আবার বায়ু পিত্ত কফের সূক্ষ্মত্ব বশতঃ উহারা সূক্ষ্মাংশ দ্বারা পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন

"একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্ব্বানেব প্রকোপয়েৎ।" ইতি।

বায়ু পিত্তের ন্যায় কফেরও বিশেষ বিশেষ স্থান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা "উরঃ শিরোগ্রীবাসর্ব্বান্যামাশয়ো মেদশ্চ শ্লেষ্মণঃ স্থানানি তত্রামাশয়ো বিশেষণ শ্লেষ্মস্থানং।" অর্থাৎ বক্ষঃ, মস্তক গ্রীবা আমাশয় ও মেদ শ্লেষ্মার স্থান, তন্মধ্যে আমাশয় বিশেষ স্থান।

আমাশয়কে কফের বিশেষ স্থান বলার প্রধান কারণ এই, আমাশয়েই অন্নরস হইতে মলভূত শ্লেষ্মার উদ্ভব হয়; এই আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মাই অন্যান্য স্থানস্থিত শ্লেষ্মার শক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। যথাহ সুশ্রুত "তত্রস্থএব স্বশক্ত্যা শেষাণাং শ্লেষ্মস্থানানাং শরীরস্য চোদক কর্ম্মণানুগ্রহং করোতি।"

এখন আমাশয় সম্বন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমাশয় শব্দের শব্দার্থ এই, আমস্য অপক্ক ভক্তদ্রব্যস্য আশয়ঃ অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য প্রাণ বায়ু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া উদরের যে অংশে প্রথম পতিত হয়, তাহাকে আমাশয় বলে। এই আমাশয় অগ্ন্যাশয় বা গ্রহণী নাড়ীর উপরে অবস্থিত, এই আমাশয়কেই চলিত কথায় পাকস্থলী বলে। আমাশয় দেখিতেও একটী ভিস্তি আকৃতি থলির ন্যায়। এই আমাশয়ের উর্দ্ধে বক্ষদেশে শ্লেষ্মা অবস্থান করে; অর্থাৎ আমাশয়ে অন্নরস হইতে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হইয়া বক্ষে অবস্থিতিকরে। এই উদরঃস্থ শ্লেষ্মা অবলম্বক শ্লেষ্মা। শিরঃ ও গ্রীবাস্থিত শ্লেষ্মা তর্পক শ্লেষ্মা। আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা ক্লেদক শ্লেষ্মা, সন্ধিস্থিত শ্লেষ্মা শ্লেষক, ও রসনাস্থিত শ্লেষ্মা বোধক নামে অভিহিত হয়।

সুতরাং বায়ু ও পিত্তের ন্যায় শ্লেষ্মা ও পঞ্চনামে কথিত হয়, যথা—অবলম্বক ক্লেদক বোধক, তর্পক ও শ্লেষক। অবশ্য একই শ্লেষ্মা স্থান ও কর্ম্ম ভেদে পঞ্চ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আমরা ইহার স্থান ভেদে বিভিন্ন কার্য্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইব।

অবলম্বক শ্লেষ্মা—বক্ষঃস্থিত শ্লেষ্মা যে অবলম্বক শ্লেষ্মা—তাহা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বক্ষঃস্থ অবলম্বক শ্লেষ্মা ত্রিকস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, (ত্রিকশব্দে পৃষ্ঠবংশ ও বাহুদ্বয়ের মিলিত স্থানকে বুঝায়,) এবং রসধাতুদ্বারা হৃৎপিণ্ডের শক্তি বর্দ্ধিত করে। অর্থাৎ আমাদের ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ক হইয়া যে রস উৎপন্ন হয়, উক্ত রস পুনঃ সার ভাবে পরিণত হইয়া রসধাতু নামে কথিত হয়, এবং পরে ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। এস্থানে হৃদয় শব্দে মাংসপেশীময় হৃৎপিণ্ডই বুঝায়, যথাহ তন্ত্রে "হৃদয়ং মনসঃস্থান মোজসশ্চিন্তিতস্য চ। মাংসপেশীচয়ো রক্তাপদ্মাকার মধোমুখং মুখং॥ যোগিনো যত্র পশ্যন্তি সম্যগ জ্যোতিঃ সমাহিতাঃ। রসোযঃ স্বচ্ছতাং যাতঃ সতত্রৈবাতিষ্ঠতে॥ ততো ব্যানেন বিক্ষপ্তঃ কৃৎস্নং দেহং প্রপদ্যতে।" দেখিতে হইবে অবলম্বক শ্লেষ্মা রসধাতুর সাহায্যে কিভাবে হৃদয়ের শক্তি রক্ষা করে। আমরা পিত্তের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, সাধক পিত্তের স্থান হৃদয়, সেই হৃদয়াশ্রিত সাধক পিত্তের উষ্মা দ্বারা হৃদয়স্থ রস ধাতু বিশুদ্ধ হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ হৃদপিণ্ড একটী প্রধান রক্তকোষ; সুতরাং হৃৎপিণ্ডে নিয়তই রক্ত সঞ্চারিত হইতেছে। অতএব হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরস্থ রক্তের উষ্ণগুণ দ্বারা ও রসধাতু শোষতি

হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শোষণগুণ বিরোধী সোমাত্মক শ্লেষ্মা রসধাতুর সেই শোষন রক্ষা করিয়া হৃদয়ের শক্তি ও স্নিগ্ধতা অক্ষুন্ন রাখে; সেই জন্যই বোধ হয় বক্ষঃস্থিত শ্লেষ্মার অবলম্বক নামে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ হইয়াছে।

ক্লেদক শ্লেষ্মা আমাশয়ে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্যকে ক্লিন্ন করিয়া থাকে; এবং সংঘাত ভুক্ত বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তজ্জন্যই ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

বোধক নামক শ্লেষ্মা জিহ্বামূল ও কণ্ঠে অবস্থান করিয়া রসনার রস বোধক সামর্থ্য দান করে। জিহ্বা বিশুষ্ক থাকিলে তখন তাদৃশ রস জ্ঞান হয়না, কিন্তু যখন রস্যমান দ্রব্যের সহিত সরসজিহ্বার সংস্পর্শ হয় তখনই রসজ্ঞান হইয়া থাকে। সেই জিহ্বার সরস্বত্বের প্রতিবোধক শ্লেষ্মাই কারণ।
তর্পক শ্লেষ্মা মস্তকে অবস্থিতি করিয়া চক্ষুকে তর্পিত ও স্নিগ্ধ রাখিয়া থাকে।

শ্লেষক শ্লেষ্মার স্থান শরীরের সন্ধি মণ্ডল। এই শ্লেষক শ্লেষ্মা সন্ধি দেশে থাকে বলিয়া হস্ত পদাদি অবয়বের সহজে সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; এবং সন্ধিস্থলের নিয়ত সঞ্চালন হেতুক সন্ধিস্থিত অস্থি সমূহের পরস্পর ঘর্ষণ লাগিলেও তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না। এসম্বন্ধে সুশ্রুতে শারীর স্থানে চতুর্থ অধ্যায়ে একটী সুন্দর উদাহরণ যুক্ত শ্লোক আছে যথা,—"স্নেহাভ্যক্তে যথা অক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে। সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা।" অর্থাৎ যেমন রথাদির চক্র স্নেহাভ্যক্ত হইলে কাষ্ঠাদির ছিদ্রের ভিতরে যথারীতি ঘুরিয়া থাকে, তথা সন্ধিবন্ধন ও শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত থাকায় সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই সন্ধিদেশেই শ্লেষ্মাধরা কল অবস্থান করে।

অধিকৃত শ্লেষ্মার কার্য্য।

শাস্ত্রে কফের প্রকৃত কার্য্য বলিয়াছে যথা, "স্নেহো বন্ধঃ স্থিরত্বঞ্চ গৌরবং বৃষতা বলং। ক্ষমা ধৃতি রলোভশ্চ কফ কর্ম্মা বিকারজং॥" স্নেহ দেহের স্নিগ্ধভাব, বন্ধ সন্ধিসমূহের সমতারক্ষা, স্থিরত্ব শরীরের দৃঢ়তা, গৌরব, দেহের গুরুত্ব বোধ। বৃষতা, শুক্র বৃদ্ধি, অর্থাৎ কফ বর্দ্ধক দ্রব্যই শুক্রবর্দ্ধক, সুতরাং সেইজন্যই শুক্রবৃদ্ধি কফেরই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলশক্তি, ক্ষমা সহনশীলতা, ধৃতি ধৈর্য্য, অলোভ লোভ শূন্যতা।

কফের গুণ সম্বন্ধে বাগ্‌ভটে "স্নিগ্ধঃ শীতো গুরু র্মন্দঃ শ্লেষ্মো মৃৎস্নঃ স্থিরঃ কফঃ" ইতি। স্নিগ্ধ স্নেহগুণ যুক্ত সুতরাং শ্লেষ্মা শরীরের স্নিগ্ধতা সম্পাদনকরে, অতএব রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ গুণ যুক্ত বায়ু পিত্তের দ্বারা শরীর শুষ্ক হইতে-পারেনা। শীত ও শীতল, সুতরাং পিত্ত সন্তাপ হইতে দেহকে রক্ষাকরে, গুরু গুরুত্ব গুণযুক্ত মন্দ চিরকারী, অর্থাৎ শ্লেষ্মার বিকৃত ওঅবিকৃত কার্য্যসমূহ ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়। শ্লক্ষ্ণ অপরুষ, অর্থাৎ কর্কশতা শূন্য। মৃৎস্ন অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা মর্দ্দন করিলে ঘৃতাদির ন্যায় গলিয়া পড়ে। এই মৃৎস্ন গুণ বশতঃ শ্লেষ্মা সন্ধিদেশে থাকিয়া সন্ধিসমূহের সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করে। স্থির অচঞ্চল, অর্থাৎ জলাদির ন্যায় ব্যাপনশীল নয়। কফের এই সমস্ত গুণ স্বাভাবিক, অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ গুণ সম্পন্ন আহার বিহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বিপরীত গুণ বিশিষ্ট আহার বিহার

দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই চরকমুনি লিখিয়াছেন "সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণং। হ্রাসহেতু র্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তি রুভয়স্যতু।"

বায়ু পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা পৃথক্ পৃথক্ভবে প্রকাশ করিলাম। এখন উপসংহারে বায়ুপিত্ত কফের সমবায় ভাবে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মহামতি চরক শারীর স্থানে বায়ু পিত্ত কফকে প্রসাদ ও মল দুই ভাগে বর্ণনা করিয়াছেন; যথা "প্রকুপিতাশ্চ বাতপিত্ত শ্লেষ্মাণো যেচান্যেহপি কিঞ্চিৎ শরীরে তিষ্ঠন্তি ভাবাঃ শরীরস্যোপঘাতায়ো উপপদ্যন্তে, সর্ব্বাং স্তান্ মলান্ সংপ্রচক্ষ্মহে।" ইহার ভাবার্থ এই প্রকুপিত বায়ুপিত্ত কফ এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থ শরীরের বিঘ্নকর হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদার্থকে মল বলা যায়, এই জন্যই কুপিত বায়ুপিত্ত কফকে মলিনীকরণামল বলিয়া থাকে। তথা বাগভটেও "সর্ব্বেষা মেব রোগানাং নিদানং কুপিতাঃ মলাঃ।" এই বাক্য দ্বারা কুপিত বায়ুপিত্ত কফ মল সংজ্ঞায় শব্দিত হইয়াছে। আবার "শরীরং দূষয়তীতি দোষ" এই অন্বর্থ বলিয়া কুপিত বায়ু পিত্ত কফের দোষ সংজ্ঞার যোজনা হইয়াছে। অতএব 'মল' আর 'দোষ' বায়ুপিত্ত কফ রূপ একই পদার্থে একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভাবমিশ্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দূষ্যন্তেভি র্যতস্ততঃ। বাত পিত্ত কফ। এতে ত্রয়োদেষা ইতি স্মৃতাঃ॥ তে ধাতবো হপি বিদ্বদ্ভি র্গদিতা দেহ ধারণাৎ। মলাশ্চতে রসাদীনাং মলীনীক রণাম্মলাঃ॥

চরকের বাক্যদ্বারা স্থূলতঃ আমরা ইহাই বুঝিলাম যে, প্রমাদ ভূত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ বায়ুপিত্ত কফ দ্বারা আমাদের দেহ রক্ষিত হয় ও সুস্থ থাকে, এবং মলভূত অর্থাৎ কুপিত বায়ুপিত্ত কফ দ্বারা দেহ রুগ্ন বা বিনষ্ট হয়। এই জন্যই বাগ্‌ভট্ট রোগ লক্ষণ করিয়াছেন; "বিকারো দোষ বৈষম্যং" বৈষম্য প্রাপ্ত বায়ু পিত্ত কফকে মল বা দোষ বলে। এই বায়ুপিত্ত কফে প্রসাদত্ব আর মলত্ব যুগপৎ অবস্থান করে না। অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কফ যখন মলীভূত হয় তখন উহাদের সর্ব্বাবয়বই মলতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বমনাদির দ্বারা নির্গত পিত্ত বা কফই মলভূত এবং তৎকালে অভ্যন্তরে স্থিত যে পিত্ত কফ তাহা প্রসাদভূতই আছে এইরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, যে হেতুক, বমন বিরেচন দ্বারা নিঃসৃত যে কফ ও পিত্ত তাহারা মলীভূত পিত্ত কফের বৃদ্ধ্যংশ মাত্র। অন্যথা কেবল বমন বিরচন দ্বারাই পিত্ত কফ রোগ সকল প্রশমিত হইত।

আমাদের প্রস্তাবিত বায়ু পিত্ত কফের মধ্যে বায়ুই প্রধান, কারণ বায়ু স্বতন্ত্র ক্রিয়াশীল। বায়ুক্রিয়া অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করেনা, কিন্তু পিত্ত ও কফ সম্পূর্ণ বায়ুশক্তির অধীন। বায়ু যদি কুপিত পিত্ত কফকে চালিত করিয়া আমাশয়াদি স্থানে নিয়া না যায়, তবে পিত্ত কফজ কোন ব্যাধিই জন্মিতে পারেনা। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবোমল ধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ॥" বায়ুক্রিয়ার একটু মজার বিশেষত্ব আছে,

পিত্ত বা কফ যে পর্য্যন্ত প্রকৃতিস্থ থাকিবে

তাবৎ তাহাকে তাহার স্বাশয় হইতে বায়ু অপসারিত করিতে পারিবেনা। তাই যদি পারিত তবে শরীরে নিরন্তর সঞ্চারণ শীল বায়ু, পিত্ত কফকে আশায়ন্তরে নয়ন করিয়া সর্ব্বদাই রোগ জন্মাইতে পারিত। পক্ষান্তরে পিত্ত কিম্বা কফ যদি কুপিত হইল, তখন আর তাহাকে তাহার নিবাসে বায়ু কোন মতেই থাকিতে দিবে না। যে ভাবেই হউক অন্যস্থানে তাড়িত করিবেই, বায়ু পিত্ত কফ সুস্থ দেহে স্বীয় আশয়ে যতখানি আকারে প্রয়োজন, তাহা হইতে যদি অল্প বা অধিক পরিমাণে অবস্থান করে তাহা হইলেই তাহাকে বায়ু পিত্ত কফের প্রকোপ বলে, ধাত্বাদির পরিমাণ সংগ্রাহক বাগভটের শ্লোক যথা—

"মজ্জমেদোবসা মূত্র পিত্ত শ্লেষ্ম শকৃন্ত্যসৃক্।
রসোজলঞ্চ দেহদেহস্মিন্নৈকৈকাঞ্জলি বর্দ্ধিতং॥
পৃথক্স্বপ্রসৃতং প্রোক্তমোজোমস্তিষ্ক রেতসাং।
দ্বাবঞ্জলীতু স্তন্যস্তচত্বারো রজসঃ স্ত্রিয়াঃ।
সমধাত্বোরিদং মানং বিদ্যাদ্ বৃদ্ধি ক্ষয়াবতঃ॥

ইহার ভাবার্থ এই—এই পঞ্চভূতাত্মক সুস্থ দেহে, মজ্জধাতু, একাঞ্জলি, মেদঃ দুই অঞ্জলি, চর্ব্বি তিন অঞ্জলি, মূত্র চারি অঞ্জলি, পিত্ত, পাঁচ অঞ্জলি, শ্লেষ্মা ছয় অঞ্জলি, পুরীষ সাত অঞ্জলি, রক্ত আট অঞ্জলি, রসধাতু নয় অঞ্জলি, জল দশ অঞ্জলি, পরিমিত বিদ্যমান থাকে, এবং ওজঃ, মস্তিষ্ক ও শুক্র প্রত্যেকে অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমাণে অবস্থান করে। স্ত্রীদিগের স্তন্য দুই অঞ্জলি ও রজঃ চারি অঞ্জলি পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু দেহ বিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। উক্ত পরিমিত ধাত্বাদি যখন শরীরে সমভাবে অবস্থিতি করে তখন তাহাকে সমধাতু বা সুস্থ বলা যায়, আর যখন বৃদ্ধি বা ক্ষয়রূপ ব্যত্যয় উপস্থিত হয় তখনই বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

গর্ভাশয়ে যে শুক্র শোণিতের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়। সেই শুক্র শোনিতে যদি বায়ুর অংশ বেশী থাকে, তাহা হইলে বাত প্রকৃতি, পিত্তাংশের আধিক্যে পিত্ত প্রকৃতি ও কফের আধিক্যে কফ প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব জন্মিয়া থাকে। এবং বাতাদির মধ্যে দুইয়ের আধিক্যে দ্বন্দজ ও তিনের আধিক্যে ত্রিদোষ প্রকৃতির উদ্ভব হয়। এই বায়ুপিত্ত ও কফ জন্ম হইতে অবসান পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে। এবং ইহাদের সমতায় স্বাস্থ্য ও বৈষম্যে রোগোৎপত্তি হয়। তাই চরক বলিয়াছেন—"নিত্যাঃ প্রাণভৃতাং দেহে বাতপিত্ত কফাস্ত্রয়ঃ। বিকৃতাঃ প্রকৃতি স্থাবা তান্ বুভুৎসেতপণ্ডিতা॥"

বায়ুপিত্ত কফ অনিয়ামিত আহার বিহার দ্বারা কুপিত হয় অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কফের সমান গুণ বিশিষ্ট আহার বিহার করিলে উহারা সপ্রমাণ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগ জন্মাইয়া থাকে, এবং বায়ুপিত্ত ও কফের বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট আহার বিহার সেবিত হইলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষয়জনিত রোগ উৎপাদন করে, এই অনিয়মিত আহার বিহারকে "নিদান" বলে। শাস্ত্রে নিদানকে সূক্ষ্মভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, যথা সাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম। ইহার ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিয়া কেবল বায়ুপিত্ত কফের প্রকোপ বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগের মূল কারণ বায়ু-পিত্ত কফ্ এবং পাশ্চাত্য মতে অন্ততঃ কতক-গুলি রোগের মূল জারম্ বা জীবাণু। এখন এই দুই মতের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার বিশে-ষতঃ আমার অসাধ্য। কারণ আমি বাঙ্গালা কবিরাজ, ইংরাজী জলের গন্ধও পেটে নাই। ডিগ্রীতো আকাশ কুসুম। তবে আমার ডিগ্রী ধারী ডাক্তার দাদাগণ ও ভাইদের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছি তাহা অকাট্য বিশ্বাস করিয়া দুই একটী কথা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

আমাদের তরুণ জ্বরে, আমাদের আগন্তুক জ্বরে, আমাদের মসূরিকা জ্বরে, আমাদের যক্ষ্মাজ্বরে ডাক্তারগণ রক্তের ভিতরে কোন প্রকার জারম্ দেখিতে পান না। জারম্ দেখিতে পান ম্যালেরিয়া জ্বরে ও কালাজ্বরে। আচ্ছা, যে জ্বরে জারম্ নাই তাহার উৎপাদক কে? আবার ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র মহৌষধ কুইনাইন। অর্থাৎ কিনা, ম্যালেরিয়া জারম্ নষ্ট করিতে কুইনাইনই ব্রহ্মাস্ত্র, এখন তাই যদি হয়, তবে সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন জারম্ নাশক হয় না কেন? যদি জরমের প্রকার ভেদ স্বীকার করা যায়, তবে তাহার কারণ কি? অবশ্য সেখানে অন্য কিছু কল্পনা করিতেই হইবে, তাহা হইলে কল্পনার আনন্ত্য দোষ উপস্থিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিত-গণ কিন্তু অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন "নাস্তি রোগো বিনা দোষৈ র্যস্মাৎ তস্মাদ্ বিচক্ষণ। অনুক্তমপি দোষানাং লিঙ্গৈর্ব্যাধি মুপাচরেৎ॥"

মহর্ষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে প্রকৃত রোগোপশম করা হয় না, তাই তাঁহারা রোগের মূল তত্ত্ব বায়ুপিত্ত কফকেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বত্রই বায়ুপিত্ত কফের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃত ক্রিয়া সমূহ ও লক্ষণাবলী তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা প্রত্যেক রোগে বাতাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিয়াও সাক্ষাৎ ফল দেখাইয়াছেন। আমরা আদি পাশ্চাত্য ম্যালেরিয়া জ্বরে আয়ুর্ব্বেদের বিষম-জ্বরের দোষ ভেদে চিকিৎসা করিয়া জারম্ ধ্বংস করিতে পারি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য নব্য জারম্ কল্পনা হইতে আয়ুর্ব্বেদের বাত পিত্ত কফ তত্ত্ব কেন উৎকৃষ্টতর বলিবনা? পাশ্চাত্য মতে এক জ্বরেই জারম্ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা দেখিতে পাই; আবার তাঁহাদের মত ও নিত্য নূতন নূতন ভাবে উদ্ভূত হইতেছে;—সুতরাং তাঁহাদের কল্পণা তাঁহারাই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ নিতসত্য বস্তু অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয়। আর যাহা মাত্র কল্পনা প্রসূত তাহা লোক চরিত্রের ন্যায় নিত্য চঞ্চল।

আমি বায়ুপিত্ত কফের প্রবন্ধ এইখানেই ক্ষান্ত করিলাম, আপনারা যে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া ধৈর্য্যের সহিত আমার নগণ্য প্রবন্ধ শুনিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

আপনাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যে, দয়া বা স্নেহ করিয়া আপনারা যদি আমার প্রবন্ধের দোষাবলী সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা হইলে, আমার প্রবন্ধে পাঠের উদ্দেশ্য সফল হয়, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃতিত্ব বিস্তারের জন্য এই প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই; প্রবৃত্ত হইয়াছি কেবল শিক্ষা লাভের জন্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ শাস্ত্র আর নাই। যাহার সামান্য ভুলে শতশত অমূল্য জীবন নষ্ট হইতে পারে, এবং যাহার সাহায্যে লক্ষলক্ষ মুমূর্ষু জীবন লাভ করিতেছে, এতাদৃশ শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্বজ্জন সমীপে পুনঃপুনঃ আলোচনা হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।

———

দূর্ব্বা।

(শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ)

(১)

দূর্ব্বে! নিত্যক্ষেমময়ি! যতনে তোমায়—
মনে হয়, সর্ব্বশীর্ষে-করিগো স্থাপন।
ভৈষজ্যমন্দির মাঝে, কেন তুমি হায়!
অবনীতে সহ নিতি, চরণ দলন॥

(২)

পুরাঙ্গনা সেও জানে আদর তোমার—
মাঙ্গলিকী ক্রিয়া তাই তোমা ভিন্ন নয়।
সর্ব্বপুষ্পময়ী তুমি শাস্ত্রেও প্রচার,
দেবপদে তব শোভা হয় উপচয়॥

(৩)

ক্ষুদ্রকায়া তৃণজাতি যদিও সুন্দরি!
কিন্তু কয়জন হেন সুবীর্য্যশালিনী,—
ঋষি তব বীর্য্যাধিক স্বচক্ষে নেহারি'—
আখ্যা দিল তাই বুঝি আয়স-দ্রাবিণী॥

(৪)

কষায়-মধুর-তিক্ত রসবতী তুমি,—
দাহ, তৃষ্ণা, রক্তদোষ কর নিবারণ।
তোমার করুক সেবা কুষ্ঠনাশ-কামী
আশু নাশ কর আর অস্ত্রবিস্রাবণ॥

(৫)

রক্তপিত্তে তোমা সম আর কেহ নাই,
অঙ্গ চ্ছেদে হও তুমি ভরসা প্রধান,
তোমার স্বরস পানে দেহে বল পাই,
দলিত হ'য়েও কর জীবের কল্যাণ।

(৬)

তব পূত দলচয়ে,—পরমায়ু তরে,—
হিতৈষী মঙ্গল দিনে আশীষে যেমন—
যতনে সংগ্রহি তোমা, "আয়ুর্ব্বেদ" শিরে
দিনু শুভে। কর তা'র অক্ষয় জীবন॥